মার্চ ২০২৬ ■ ফাল্গুন–চৈত্র ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২৬শে মার্চ ২০২৬ ঢাকায় সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২৬ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২৬শে মার্চ ২০২৬ ঢাকায় সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মো. ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগঃ সম্পাদনা শাখা
৮৩০০৬৮৭
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

মার্চ মাস বাঙালি জাতির জীবনে এক অগ্নিঝরা, উত্তাল এবং গৌরবোজ্জ্বল সময়। এই মাস আমাদের স্বাধীনতার চেতনার প্রতীক, সংগ্রামের মাস এবং বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাস। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রতিটি দিনই বাঙালির সুদীর্ঘ ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনের সাক্ষী। ২৫শে মার্চ কালরাতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বীর বাঙালি স্বাধীন অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায় স্বাধীন বাংলাদেশ। মার্চ মাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে– ঐক্য, সাহস এবং সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি জাতি তার ন্যায্য অধিকার আদায়ে সফল হতে পারে। মার্চ মাস দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং পরাধীনতা ও শোষণের কাছে মাথা নত না করার অনুপ্রেরণা দেয়।

স্বাধীনতার মাসে আমাদের অঙ্গীকার হোক শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশটিকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক হিসেবে গড়ে তোলা। মহান মুক্তিযুদ্ধে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে একাধিক নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

রণাঙ্গনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও বীরত্বগাথাসহ চলচ্চিত্রে নারীর বাস্তবতা এবং সভ্যতার নিরিখে উপস্থাপন নিয়েও নিবন্ধ থাকছে এবারের সংখ্যায়।

মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব পবিত্র রমজান ও ঈদুলফিতর উদ্‌যাপিত হচ্ছে এ মাসে। রোজার তাৎপর্য ও জাকাত নিয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয় দিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* মার্চ সংখ্যাটি। আশা করি, সকলেরই ভালো লাগবে। সবাইকে পবিত্র ঈদুলফিতরের শুভেচ্ছা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

মুক্তি, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের নির্মিতি ৪
ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

মুক্তির মিছিল : প্রসঙ্গ নারী ৭
ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় মুক্তিযুদ্ধ ৯
আবু সাঈদ তুলু

সত্তরের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ১৪
জাফরুল আহসান

স্বাধীনতা ও বর্তমান বাংলাদেশ ১৯
জাহিদ ইকবাল

মুক্তিযুদ্ধে নদী ও নারীর অনন্য ভূমিকা ২৩
কামরুন-নাহার-মুকুল

স্বাধীনতার ৫৫ বছর: স্মৃতি, অর্জন ও আত্মঅনুভূতি ২৮
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

জাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে ৩০
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

২৫শে মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ ও কালরাত্রি ৩৩
রহিমা আক্তার মৌ

পিলখানায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন প্রথম বিদ্রোহ—মহান মুক্তিযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ ৩৬
মো. শরিফুল ইসলাম

স্বাধীনতার মাসে বুদ্ধিজীবীদের খোঁজে ৪০
মো. মোস্তাক আহমেদ

সিনেমার নারী— বাস্তবতা বনাম সত্যতা ৪৫
সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ৫০
ফজিলা ফয়েজ

ঈদের সেই দিন ৫২
শাকেরা বেগম শিমু

গল্প

অন্য রকম দেহতত্ত্ব ৫৪
রফিকুর রশীদ

মায়ের স্বপ্ন ৫৯
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

কবিতা

৬১-৬৩
উষা মল্লিক, মোহাম্মদ শামীম মিয়া, রেজাউদ্দিন স্টালিন, আফিয়া সিদ্দিকা, কুলসুম বিবি, শাহেদা আলম

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি জাহানারা আরজু ৬৪

মুক্তি, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের নির্মিতি

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

শিরোনাম হতে পারত 'স্বাতন্ত্র্যের নির্মিতি'। তাতেও একভাবে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হতো। কিন্তু যৌক্তিক কারণেই 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' শব্দ দুটি যুক্ত হলো। সেই যৌক্তিকতা ক্রমশ স্পষ্ট হবে। এখন 'নির্মিতি' শব্দটি নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে। 'স্বাতন্ত্র্য' যদি প্রাকৃতিক বিষয় হয়, তাহলে নির্মিতির প্রয়োজন কেন হবে? জনসমাজে সরল দৃষ্টিতে মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবেই আবিষ্কার করে এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করে এই স্বাতন্ত্র্য প্রাকৃতিক। আদতে সরল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস থেকে স্বাতন্ত্র্যের যে অংশটুকু লোকচোখে প্রতিভাত হয়, সেটুকু প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যের একটি দিক মাত্র। শারীরিক গঠন, চেহারার ফারাক ও কিছু স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সেখানে স্বাতন্ত্র্যের নির্ণায়ক। সেই বিবেচনায় 'নির্মাণ' শব্দটিকে আপাত অর্থে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

অথচ প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যের মূল আধার নৃতাত্ত্বিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্য। এই দিকটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে আলোচিত হলেও জনমানসে 'স্বভাব' শব্দের সীমাতেই অস্পষ্ট ধাঁধা আকারে রয়ে যায়। আবার নৃতাত্ত্বিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্যকেও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের নির্ণায়ক বলা যায় না। কেননা এখানেও বংশপরম্পরায় অতীত সামষ্টিক জীবনের প্রবল প্রভাব রয়ে যায়, যাকে একভাবে নির্মাণ বলাটাই যৌক্তিক। ফলে এখান থেকেই একাধারে জটিল ও গভীর 'নির্মাণ' শব্দটি প্রাসঙ্গিক হতে শুরু করে।

মানুষ সহজাতভাবেই প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এমনকি নৃতাত্ত্বিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্যও তার নিয়তি এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে অনিবার্য চ্যালেঞ্জ। বিশ্ববিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে স্বাতন্ত্র্যের এই সহজাত রূপ নিয়ে আত্মবিকশিত হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসের পথ ধরে সাম্প্রতিক উত্তরাধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় তা রূপকথাতুল্য। এখন শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে যে বিচিত্র ও অসীম প্রভাব এবং যোগাযোগের জালে বসবাস করে, তাতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য—স্বাতন্ত্র্যের বিভ্রম মাত্র। আদতে বহুকাল আগে যখন ক্রমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হলো এবং শেষাবধি বিশ্বগ্রাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নির্মাণের অধীন।

শৈশবের কথা বাদ দিলেও ব্যক্তির বিকাশ কতটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন সেই প্রশ্নেই 'নির্মিতি' শব্দটির

প্রাসঙ্গিকতা বিজড়িত। প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে জটিল দ্বান্দ্বিকতা ও সমঝোতার মধ্য দিয়েই পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বে ব্যক্তির নির্মিতি ঘটমান। এ এক চলমান জটিল চেতনা-অবচেতনগত প্রক্রিয়া। অতীত পৃথিবীর তুলনায় ক্রমশ তা আরও জটিলতর হয়ে উঠছে। এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কেবল সচেতন সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নগুলোই মানুষ অনুধাবন করতে পারে, স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে পারে। কিন্তু অলক্ষে অবচেতনগতভাবে বহুকিছুই মানুষকে নির্মাণ করতে থাকে। উত্তরাধুনিক বিশ্বায়িত পৃথিবীতে এক্ষেত্রে সজ্ঞান-সচেতন থাকা অতীতের তুলনায় আরও দুরূহ হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তির সমান্তরালে নানা অনুঘটক শক্তি যে ব্যক্তিকে নির্মাণে তৎপর, সে প্রসঙ্গে মিশেল ফুকো আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে– ক্ষমতা, জ্ঞান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের আচরণ, চিন্তা ও আত্মপরিচয়কে নীরবে সংগঠিত করে। ফলে ব্যক্তি নিজেকে যতটা স্বতন্ত্র বলে মনে করে, বাস্তবে সেই স্বাতন্ত্র্যের ভেতরেও বহু সামাজিক নির্মাণ সক্রিয় থাকে।[১]

সুতরাং বিদ্যমান জীবন বাস্তবতায় প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে অভীষ্ট বিবেচনার উপায় নেই। তবে স্বাতন্ত্র্যের নির্মিতি পর্যবেক্ষণে প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছাড়া ভিন্ন মানদণ্ডও নেই। বস্তুত, ব্যক্তির প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য থেকে মানব সভ্যতায় ব্যক্তির নির্মিতিকে পৃথকভাবে দেখা ও মূল্যায়ন অস্তিত্বের প্রাথমিক পাঠ হওয়া জরুরি। এটি স্বাধীনতার পথে সূচনাবিন্দু। এই দায়িত্ব ইতিহাস সহজাতভাবেই ধারণ করে। কিন্তু সেই ইতিহাসকে ব্যক্তির জ্ঞানভুক্ত করার দায়িত্ব বর্তায় একটি সুসভ্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর। অনগ্রসর জনপদে জন্মমাত্রই চাক্ষুষ হয় বিধায় বিদ্যমান জীবনচর্চাসহ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চিরন্তন ও প্রাকৃতিক বলেই বিবেচনা করে। আবার তীব্র অভিযোজন ক্ষমতার কারণে মানুষ নতুন কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তাকেও প্রাকৃতিক বিবেচনা করতে থাকে। ব্যক্তির বিপন্ন ও শৃঙ্খলিত হওয়ার সূত্রপাত এখানেই। যেখানে বিদ্যমানকেই অনিবার্য ভেবে তার ভেতরে পুনরাবৃত্তিমূলক জীবনযাপনই নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক এ কারণেই স্বাতন্ত্র্যের আলাপে 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা' অপরিহার্য দুটি প্রসঙ্গ। স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সজ্ঞানতা না থাকলে মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রশ্ন অবান্তর। মানুষের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য কেবল টিকে থাকা নয়; এটিই স্বরূপ এবং সে রূপে টিকে থাকা, নির্বিঘ্নে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়াই স্বাধীনতা। জ্যঁা পল সার্ত সে কারণেই বলেছেন, 'Man is nothing else but what he makes of himself.'[২]। অথচ বিবেচনা করলে দেখা যাবে, নির্বিঘ্নে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়াকে যদি উচ্চাভিলাষ হিসেবে ধরা হয়, স্রেফ টিকে থাকার প্রসঙ্গেও 'মুক্তি' বিষয়টি এসে হাজির হয়। 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দটি সেখানে মনোজগতকেও স্থান দিয়ে ব্যক্তিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। ফলে দৈহিক ও মানসিক মুক্তি ছাড়া স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব।

বলে রাখা জরুরি, মুক্তি বন্দিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। দৈহিক বন্দিত্ব থেকে মুক্তি চাক্ষুষ হলেও মানসিক মুক্তি তুলনামূলকভাবে জটিলতর প্রসঙ্গ। মানসিক মুক্তি শৃঙ্খলিত বোধ করার ওপর নির্ভর করে। ফলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে শৃঙ্খলা ও মুক্তির ধারণা বদলে যেতে পারে। তবে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। যে শৃঙ্খলিত বোধ করে, তাকে নিয়েই আলাপ অগ্রসর হতে পারে। এই যে শৃঙ্খলিত বোধ, যা মুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে তার নামই আসলে স্বাধীনতার চেতনা। স্বাধীনতার ধারণাকে রাজনৈতিক দর্শনে প্রায়ই দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আইজাইয়া বার্লিন স্বাধীনতার দুটি রূপের কথা বলেছেন, 'negative liberty' এবং 'positive liberty'। প্রথমটি বাধা থেকে মুক্ত হওয়া, দ্বিতীয়টি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা। এই আলোচনায় 'মুক্তি' মূলত প্রথমটির সঙ্গে সম্পর্কিত, আর 'স্বাধীনতা' দ্বিতীয়টির সঙ্গে।[৩]

তাই এমন উপলব্ধিতে পৌঁছানো যেতে পারে যে, স্বাধীনতার চেতনা মুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্বাতন্ত্র্য-সজ্ঞানতা স্বাধীনতার চেতনার মূলে। মুক্ত হওয়ার পর সরলার্থে মানুষ স্ব-অধীনও হয়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট না থাকলে সে স্বাধীন থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় বলা যেতে পারে মুক্তি স্বাধীন হওয়ার পথ তৈরি করে এবং স্বাতন্ত্র্য স্বাধীন থাকার উপায়। স্বাতন্ত্র্যের অতীত থাকে, বর্তমান থাকে, ভবিষ্যৎও থাকে। স্বাতন্ত্র্যের অতীত মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ বাদ দিলে, মুক্তি রাজনৈতিক বিবেচনায় ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়াকে বোঝায়; সামাজিক বিবেচনায় বৈষম্য বা শোষণ থেকে মুক্ত হওয়াকে বোঝায়। মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন হতে চাইলে স্ব-ইচ্ছা, অধিকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং পরিচালিত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। যদিও মুক্তি মুক্ত হওয়ার কথা বলে, কিন্তু মুক্ত মানেই স্ব-অধীন বা স্বাধীনতা নাও হতে পারে। যদিও মুক্তি স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। ফলে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করলে সেখানে মুক্তি রয়ে যায়, কিন্তু 'মুক্তি' বললেই স্বাধীনতা বোঝানো হয় না। কেবল মুক্তি অপরিকল্পিত ভবিষ্যতের শূন্যতায় মানুষকে ফেলে দিতে পারে; কিন্তু স্বাধীনতা পথ ও গন্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং স্বাধীনতা একার্থে স্বাতন্ত্র্যের অধীনতাও বটে।

আলোচনার এই পর্যায়ে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত করা যাক। দার্শনিক বিবেচনায় ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রেরও প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করলে তার জন্মকে দুর্ঘটনা বলতে হবে। দুর্ঘটনায় জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নিয়ে বিপন্নতা অনিবার্য। ইতিহাসে এ বিষয়ক দৃষ্টান্ত লভ্য। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ঘটে গণমানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামের পরম্পরায়, শেষাবধি সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এখানে 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা'– এই

দুটি ধারণা একই সঙ্গে উপস্থিত এবং একই সঙ্গে ভিন্ন অর্থ বহন করে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধকে আমরা যেমন মুক্তিযুদ্ধ বলি, তেমনি স্বাধীনতা যুদ্ধও বলি। এই দ্বৈত নামকরণ কেবল ভাষাগত নয়; বরং একটি গভীর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিফলন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'মুক্তি' মূলত একটি ঔপনিবেশিক-সদৃশ রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার ঘটনাকে নির্দেশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য সেই মুক্তি ছিল রাজনৈতিক অধিকারহীনতা, সাংস্কৃতিক অবদমন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রাম। এই অর্থে মুক্তিযুদ্ধ ছিল শৃঙ্খলমুক্তির এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু সেই মুক্তির মধ্যেই স্বাধীনতার পূর্ণতা নিহিত ছিল না; বরং সেখানে স্বাধীনতার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছিল। সেই সম্ভাবনার মূলেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। যে স্বাতন্ত্র্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিবিধ বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্মাণ করেছে বলেই মুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতার সূচনা ঘটেছিল।

একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কেবল সার্বভৌম ভূখণ্ড বা রাজনৈতিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বকীয় সত্তার বিকাশ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির নির্মাণ এবং জনগণের স্বশাসন ক্ষমতার মধ্য দিয়েই সেই স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে। বেনেডিক্ট এন্ডারসন যেমন কল্পিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের কথা বলেছিলেন, যা ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রমে নির্মিত হয়।[৪] অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই এ রাষ্ট্র গঠিত হতে শুরু করেছিল। সেই গঠনকালই আবার এ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যের নির্মাণকাল। সে স্বাতন্ত্র্যই মুক্তি এনে দিলো, স্বাধীনতা দিলো। এখন প্রশ্ন হলো, সে স্বাতন্ত্র্যের রূপ কী?

স্বাতন্ত্র্যের রূপ বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ জরুরি যে, একের পর এক উপনিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্ববাস্তবতায় সেই স্বাতন্ত্র্য কোন দশায় উপনীত। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর এটিই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে সূচনাবিন্দু হওয়ার কথা ছিল। আদতে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ একটি দীর্ঘতর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক চর্চা এবং নাগরিক স্বাধীনতার বিকাশের মধ্য দিয়েই সেই নির্মাণ ক্রমাগত রূপ লাভ করে। এই অর্থে রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও এক ধরনের চলমান প্রকল্প। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই নির্মাণ প্রক্রিয়া এখনো চলমান।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছিল মুক্তি স্বাধীন হওয়ার পথ তৈরি করে এবং স্বাতন্ত্র্য স্বাধীন থাকার উপায়, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক মুক্তির পথ তৈরি করেছে; কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় ও বিকাশ। এই স্বাতন্ত্র্য কেবল ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব নয়; বরং রাজনৈতিক ন্যায়, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক শাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক সম্মিলিত চেতনা। এই জায়গাতেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

ব্যক্তি যদি স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে তার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে; একইভাবে রাষ্ট্রও যদি তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তবে তার স্বাধীনতাও কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকিতে পড়ে। অতএব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, মুক্তি ও স্বাধীনতার যে সম্পর্ক পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তা বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরেও পুনরাবৃত্ত হয়। ব্যক্তি যেমন নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, রাষ্ট্রও তেমনি নিজের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করার মধ্য দিয়েই প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। এই অর্থে বাংলাদেশের ইতিহাসকে কেবল একটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হিসেবে নয়, বরং স্বাতন্ত্র্য-সন্ধানের একটি চলমান ইতিহাস হিসেবেও দেখা যেতে পারে। মুক্তি সেই ইতিহাসের সূচনা করেছে; কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ণতা এখনো নির্মাণের মধ্যেই রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), P: 27–28.

2. Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a Humanism, trans. Carol Macomber (New Haven: Yale University Press, 2007), P: 22.

3. Isaiah Berlin, "Two Concepts of Liberty," in Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 1969), P: 121–122.

4. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. ed. (London: Verso, 2006), P: 6.

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া: অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তির মিছিলঃ প্রসঙ্গ নারী

ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে স্পষ্ট হয়, যে জাতি তথা রাষ্ট্র নরনারী উভয়ের অবদানকে স্বীকার করেছে, সেই জাতি তথা রাষ্ট্র উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকাকে উপেক্ষা করাই জাতীয় অগ্রগতিতে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে বর্তমান বিশ্ব সহমত পোষণ করলেও একসময় নারীর অবদানকে স্বীকার করা হতো না বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সে কারণেই যুগে যুগে নারীকে স্বাধিকার ও মানসিক মুক্তির মিছিলে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

পুরুষতন্ত্রে নারী গৃহসামগ্রীর তুল্য ছিল। শৌর্যবীর্যের ধারাকে প্রবাহমান রাখতে নারীর গুরুত্ব স্বীকার করা হতো না। সন্তান ধারণ, লালনপালন, স্বামীর মনোরঞ্জন ছিল স্ত্রীর ধর্ম ও কর্ম। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও শিক্ষাগত অধিকার উপেক্ষা করা হতো।

নারীর সম্মান আর স্বাধীনতা— এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট বিভেদরেখা। অতীতে নারী নিজেকে সৌভাগ্য ও সম্মানের অধিকারী মনে করত তখন, যখন তার গা ভর্তি গয়না থাকত। দাসদাসী থাকত। আঁচলে চাবির তোড়া থাকত। মধ্যবিত্ত ঘরে নারীর সেই সৌভাগ্য ও সম্মান ছিল না। নারী খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাকেই সৌভাগ্য মানত।

বিশ্বজুড়ে নারীর অবস্থান প্রায় একরকম ছিল। এশিয়ার বাইরে

ইউরোপ ও আমেরিকাতেও নারীর কর্ম, ভাগ্য, অধিকার ছিল পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খলে বন্দি।

নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শুরু হয় নারীর মুক্তির যাত্রা। বিপুলসংখ্যক পুরুষ যখন যুদ্ধের অঙ্গনে, তখন স্বাভাবিকভাবেই কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ হবার উপক্রম হয়। আর এই সময়েই এসব কারখানা সচল রাখতে নারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দেশগুলো। বিপুলসংখ্যক নারী কারখানার শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হয়। এছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও নারী ডাক্তার, নার্সের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। প্রশাসন, অফিস এসব কাজেও নারীরা এগিয়ে আসে। কৃষিকাজেও নারীরা অবদান রেখে পাল্টে দেয় পুরানো সংস্কার।

যদিও এর অনেক আগে থেকেই নারীরা মুক্তির মিছিলে শামিল হয়েছে বিভিন্ন দাবিতে। ১৮৪৮-এ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক আন্দোলনে নারীরা ভোটাধিকার ও আইনি সমতার দাবিতে সোচ্চার হয়। Second-wave feminism, Women's Liberation Movement, Women's Suffrage Movement– এসবই ছিল নারীর দাবি আদায়ের আন্দোলন। একসময় সেইসব দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছে পুরুষসমাজ।

এভাবেই যুগে যুগে নারীরা তুলেছে আওয়াজ। সমান কাজের সমান মজুরি, প্রজনন অধিকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নারীকে মিছিল করে আদায় করতে হয়েছে।

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নারী বঞ্চিত ছিল আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার থেকে। নারীর চিত্তের মুক্তি ঘটাতে পারলেই নারীকে স্বাধিকার অর্জনে যোগ্য করে তোলা সম্ভব ভেবেছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যসেবী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বুঝেছিলেন, নারীকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে হবে। শিক্ষাই সকল অন্ধত্ব মোচনের উপায়।

মেয়েদের স্কুল, কলেজে পড়াশুনার অধিকার তৈরি হলো। মেয়েরা অনুধাবন করল, তারা পুরুষের সমান যোগ্যতায় যোগ্য, দক্ষ ও নিপুণ হতে পারে। খুব সহজ ছিল না প্রথমদিকে মেয়েদের এই পথচলা। আঘাত এসেছে বহুভাবে। সমাজ-ধর্ম অনুশাসন মেয়েদের টেনে ধরেছে বার বার।

নারীর হিতসাধনে এবং উন্নতিতে এগিয়ে এসেছেন নারীর পাশাপাশি পুরুষরাই। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয়। বাল্যবিবাহ নিরোধ, বহুবিবাহ বন্ধ, সতীদাহ প্রথা বাতিল, কুলীনপ্রথার উচ্ছেদ না ঘটলে নারীর মুক্তির মিছিল বেগবান হতো কি না সন্দেহ।

নারীদের দক্ষতা-যোগ্যতা কেবলই শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে আটকে থাকেনি। নারী অবতীর্ণ হয়েছে যুদ্ধে, বিপ্লবে, নেতৃত্বে, রাষ্ট্র পরিচালনায়। নারীর মুক্তি ঘটেছে চিন্তায়-চেতনায়। এতকিছুর পরেও নারীর অধিকার, সুরক্ষা, সমতা সর্বত্র প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বলেই নারীকে আজও মিছিলে শামিল হতে হচ্ছে।

নারী সুরক্ষা আইন কাগজেকলমে থাকলেও নেই নারীর সুরক্ষা নিরাপত্তা। পদে পদে নারী হেনস্তার শিকার হয়। নারীর সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে ঘরে-বাইরে।

বর্তমান বিশ্বেও নারী হাতবদল হয়, নির্যাতিত হয়, ধর্ষিত হয়, খুন হয়। গুটিকতক নারীর ভাগ্যোন্নয়নকে সামগ্রিক নারীমুক্তি বলা যায় না। উন্নত-অনুন্নত বলে আজ আর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই নারীর জন্য।

২০১৭ সালে প্রথম নারীরা সরব হন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে। বিশ্বজুড়ে এই আন্দোলন আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অবস্থা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। এর মূলে বেশকিছু কারণ রয়েছে তার মধ্যে– অশিক্ষা, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, আইন প্রয়োগের দুর্বলতা, সামাজিক নীরবতা ইত্যাদি অন্যতম।

নারীসমাজ কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। নারীর নিরাপত্তা প্রদান, মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা সকলের মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব। সমাজে যদি ন্যায়বিচার ও সমতার মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়, তবেই নারীর মুক্তি তথা সমাজের সামগ্রিক মুক্তি সম্ভব।

নারী আজ স্বাবলম্বী। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। অতীতের গ্লানি থেকে মুক্ত। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে, গবেষণায়, যুদ্ধে সর্বত্র অবদান রেখে চলেছে দক্ষতার সাথে।

এতকিছুর পরেও নারী মুক্তির মিছিল থেকে নিরাপদ নিশ্চিন্ত সমাজের আশ্রয়ে ফিরতে পারে না। এ বিষয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা যথেষ্ট। আশায় বসতি রেখে ভাবতে ভালো লাগে, আমরা আগামীতে এমন দিন পাব, নারীরা আর 'নারী' হিসেবে কোনো মিছিল করবে না। মিছিলে অবতীর্ণ হবে 'মানুষ' হিসেবে।

ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

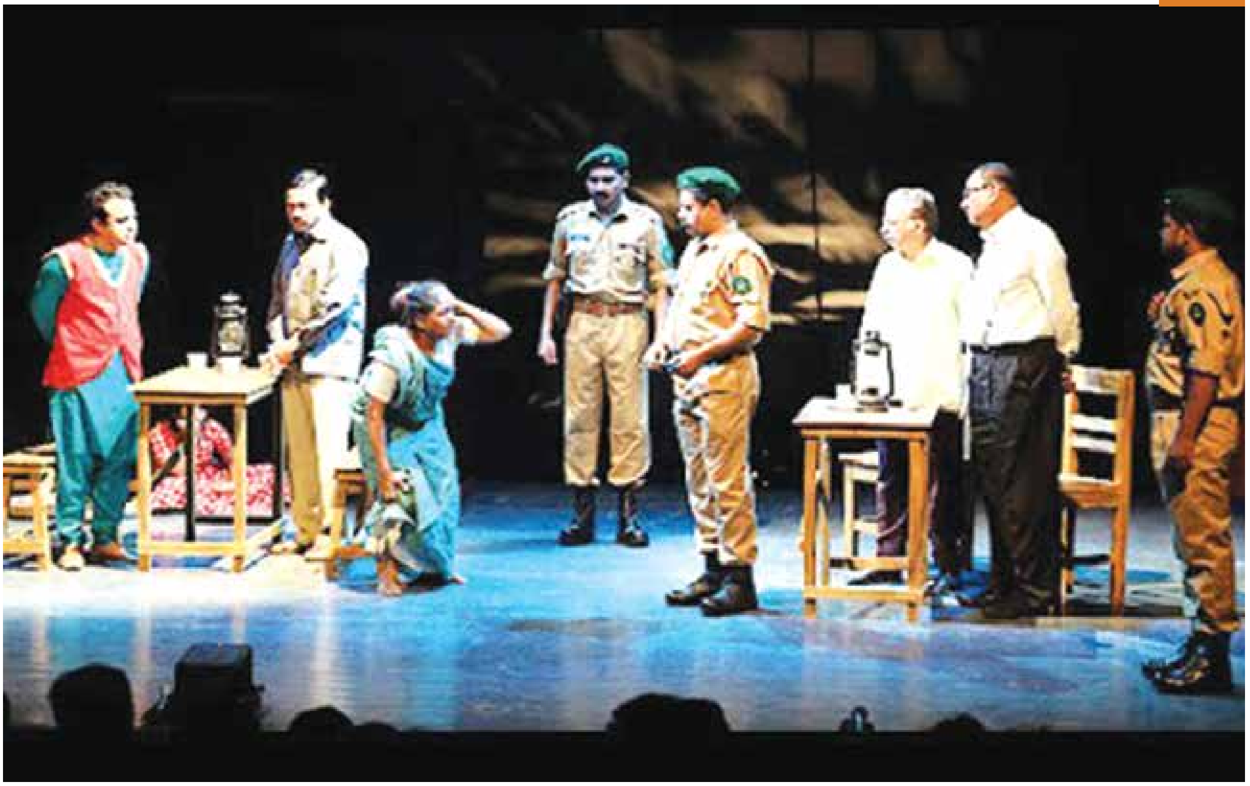

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় মুক্তিযুদ্ধ

আবু সাঈদ তুলু

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কেবল একটি ভূখণ্ড বা মানচিত্র জয়ের লড়াই ছিল না, এটি ছিল একটি জাতির আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মহাকাব্য। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকও এই অবিনাশী চেতনাকে ধারণ করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত নাটকগুলো কেবল রণাঙ্গনের বীরত্বগাথা নয়, বরং যুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়, বীরাঙ্গনাদের আর্তনাদ এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের অদম্য সাহসের জীবন্ত দলিল। দীর্ঘদিনের বাঙালির যে নাট্যচর্চা এদেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, একাত্তরে এসে তা যেন মুক্তির সংগ্রামী নাট্যে রূপ নিয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এ চেতনা জাতীয়তাবোধে ক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান নিবন্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করব।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে বিকশিত ক্ষেত্র নাট্যকলা। সারাদেশে প্রায় সাত শতাধিক নাট্যদল নিয়মিতভাবে নাট্যচর্চা করে থাকে। নাট্যকলা বিদ্যা উঁচু শিক্ষাস্তরে এখন পাঠ্য বিষয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই মুক্তির চেতনা নাটকে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। মমতাজউদদীন আহমদ, ড. ইনামুল হক, নীলিমা ইব্রাহিম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, মুহম্মদ এহসানুল্লাহ, রনেশ দাশগুপ্ত প্রমুখের রচনায় মুক্তিসংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে। তাছাড়াও আবদুল্লাহ আল মামুন, সেলিম আল দীন, আল মুনসুর, মামুনুর রশীদ, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, মান্নান হীরা, রবিউল আলম, এসএম সোলায়মান, শওকত খান, মলয় ভৌমিক প্রমুখ জনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ কখনো সরাসরি কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যরচনায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ, ভয়াবহতা ও বীভৎসতার চিত্র নানা অনুষঙ্গে নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী বাস্তবতানির্ভর নাটক মমতাজউদ্দীন আহমদ ও ড. ইনামুল হকের রচনার মধ্যে প্রথম ভালোভাবে লক্ষ করা যায়। তবে শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতার শরণার্থী শিবিরে মামুনুর রশীদ 'পশ্চিমের সিঁড়ি' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো সঠিক তথ্য-প্রমাণ এই গবেষকের হাতে নেই।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাট্যরচনায় যাঁরা সর্বাগ্রে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মমতাজউদদীন আহমদ। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক 'কী চাহ শঙ্খচিল' ও 'বর্ণচোরা'। যদিও তাঁর নানা নাটকেই মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের উত্তাল মুহূর্তে রচনা করেছেন 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'। নাটকে মাত্র ৪টি চরিত্র– নূর মোহাম্মদ, দলিলুর রহমান, আবদুল বাকের মণ্ডল ও জনৈক লোক। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা এ নাটকে স্পষ্ট সংলাপে নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন–'হামরা এই নদীর দেশের মানুষ, একটু যুদ্ধ চাই মালিক, স্বাধীনতার যুদ্ধ।' একটি অঙ্কের ছোট্ট এ নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পাকিস্তানের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা। একই বছর 'এবারের সংগ্রাম' নাটকে ফুটে উঠেছে পাকিস্তানি শোষকদের নিপীড়নের চিত্র। বাদশাহ, উজির, সিপাহসালার প্রভৃতি প্রতীকী চরিত্র ব্যঞ্জনায় পাকিস্তানি শোষক, আর মানুষ চরিত্রে গণমানুষের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। নাটকটি ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চে পথেঘাটে খোলামঞ্চে হাজারো মানুষের সামনে অভিনীত হতো। নাটকের শেষে মানুষ চরিত্রটি বলে– 'পালিয়ে যাবে কোথায়? এদেশের কোনো ঘরে তার আশ্রয় জুটবে না। মাইলকে মাইল মানুষের মিছিল নিয়ে এদেশের সবখানে ওর তল্লাশি চালাবে। খুঁজে বের করবই জুলুমবাজকে। আমার ছেলের রক্তের দাম আমি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেব। ভাইসব, সূর্যের আগুনে শরীরকে তাতিয়ে নাও। এসো, ঘর ছেড়ে বাইরে এসো, শ্যামল ঘাসের দেশে– এবারের সংগ্রাম, (ঐক্যবদ্ধভাবে) স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

মমতাজউদদীন আহমদ ১৯৭১ সালের ২১শে মার্চ রচনা করেন 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এতে বর্গীওয়ালা, হুকমত খাঁ, দুখু মিয়া, বৃদ্ধ, ফারুক, গায়ক, জহুরুল, ঝকড়ু প্রভৃতি সমকালীন চরিত্র নির্মাণ করেছেন। গণহত্যা এ নাটকের সঙ্গী। এটি মুক্তিযুদ্ধের সময় খোলামঞ্চে অভিনীত হতো। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রচিত 'বর্ণচোরা' নাটকে ফুটে উঠেছে যুদ্ধ-উত্তর মানুষের কষ্ট ও প্রতারণা। 'এই সেই কণ্ঠস্বর' নাটকে শোষকের বিরুদ্ধে জাগরণী শক্তিই পরতে পরতে। মুক্তিযুদ্ধকালীন নারী নির্যাতনের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে 'কী চাহ শঙ্খচিল', যার কেন্দ্রীয় চরিত্র রোশনারা। সে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত প্রতিবাদী অবয়ব। মমতাজউদদীনের যুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকগুলো দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্ধত শিল্পের অস্ত্র। শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠস্বর। বিপ্লবী নেতার মতোই মানুষকে নিয়ে চলে মুক্তির পথে।

মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চিত্র যার নাটকে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে তিনি ড. ইনামুল হক। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ টেলিভিশনে প্রচারিত হয় ইনামুল হকের নাটক 'আবার আসিব ফিরে'। ১৯৭২ সালের মার্চে স্বাধীন বাংলাদেশের টেলিভিশনে যে নাটকটি প্রচারিত হয় সে নাটকটি ইনামুল হকের রচনা। নাম 'বাংলা আমার বাংলা'। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নাটক হিসেবে স্বীকৃত। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। এ নাটকে দেখানো হয়েছে পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচারের বর্বর কাহিনি। সেসময় অভিনয় করেছিলেন– কাজী তামান্না, আবুল হায়াত, মো. আনসার, সুজা খন্দকার প্রমুখ। এর ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল। ইংরেজি ভার্সন Sound of fury and freedom নামে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। নাটকে চরিত্র ১৩টি। এর একটি সংলাপ দীর্ঘদিন ধরে জনমনে বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল– 'বাঙালি হয়ে জন্মানোই তো পাপ।' নাটকের দৃশ্যে–

কালু : আহারে কত রক্ত।

সেলিনা : ভাইয়া, তুমি কথা বলছো না কেন ভাইয়া?

ফারুক : কথা। ওরা আমার মুখ থেকে কথা বের করতে চায়, কিন্তু ওরা জানে না সাড়ে সাত কোটি বাঙালির রক্তাক্ত হৃদয়ের সব কথা বাঁধা পড়েছে একটা স্বর্ণ তোরণের চাবিকাঠিতে। আর সে চাবিকাঠি হচ্ছে বাংলার স্বাধীনতা, বাঙালির মুক্তি, আমার বঙ্গজননীর অশ্রু মোচন।

সেলিনা : ভাইয়া এসো। তোমার রক্তের দাগ মুছে দি।

ফারুক : তুই রক্ত বলছিস কাকে বোন। এতো রক্ত নয়। এ হচ্ছে আমাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি, বাংলার মুক্তিসনদ।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচিত নাটকগুলোর প্রায় অধিকাংশই ড. ইনামুল হকের নাটকের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। অনেকটা স্টেরিওটাইপ বলা যেতে পারে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক– 'প্রতিধ্বনি প্রতিদিন', 'সেইসব দিনগুলো', 'সন্ধিক্ষণে আমরা', 'প্রতীক্ষার প্রহর', 'মেঘভাঙা রোদ', 'অতঃপর একদিন' ইত্যাদি। এসব নাটকে উঠে এসেছে নানা প্রশ্ন। এগুলোর কোনোটা মঞ্চে, কোনোটা টেলিভিশনে কিংবা বেতারে প্রচারিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি আলেখ্য নিয়ে রচিত মঞ্চনাটক 'সেইসব দিনগুলো' -এর ওপর ভিত্তি করে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা হৃদি হক সম্প্রতি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৭৪ সালে রচনা করেন 'নরকে লাল গোলাপ'। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নারকীয় পরিস্থিতি ও যন্ত্রণার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন। 'নরক' অর্থে পাকিস্তানিদের অত্যাচারী ভয়ংকর রূপ এবং 'লাল গোলাপ' দিয়ে সাহসিকতা, সম্ভাবনা কিংবা স্বাধীনতাকে ইঙ্গিত করেছেন। নাটকটি অসামান্য সংলাপ ও নাট্যগুণে অনন্য।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর ঢাকার মহিলা সমিতি এ মঞ্চে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নির্দেশনা দিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। এ যাবৎ নাটকটির দুশোর বেশি প্রদর্শনী হয়েছে। সেসময় এ নাটকে অভিনয় করেন– আবদুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, মোহাম্মদ জাকারিয়া, আবদুল কাদের, তারিক আনাম খান, মিতা চৌধুরী, তারানা হালিম, খায়রুল আল সবুজ, আরিফুল হক প্রমুখ।

বাংলার গ্রামীণ জীবনে 'পায়ের আওয়াজ' একটি রূপক শব্দ। এক ধরনের ভাবব্যঞ্জক শাব্দিক অনুসরণে অনুকৃত নামকরণ। মূলত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা, ধর্ষণ, হত্যা, গ্রামীণ মোড়লের ভূমিকা, রাজাকারদের দুষ্কর্ম, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ চেতনার প্রেক্ষিতে মানবীয় আখ্যান এ নাটকটি। মূল চরিত্র রাজাকার মোড়ল দ্বৈত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়– মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতায় গ্রামবাসী মানুষদের মধ্যে বিরাজ করে ভয়-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা। চারপাশের প্রায় সব গ্রামের নারী-পুরুষ এসেছে মাতবরের কাছে। মাতবর তাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। গতরাতেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে; কথা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন। কিন্তু গ্রামবাসী যেন ভরসা রাখতে পারছেন না। এ সময় ঘটে আরেক ঘটনা। মাতবরের মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে চলে আসে। সবাইকে জানাতে চায় তার বাবা পাকিস্তানিদের দোসর। তার বাবা মাতবর গতরাতে জোর করে নিজের মেয়েকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিল। অপমানে-আত্মগ্লানিতে মাতবরের মেয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু মাতবর যে যুক্তিতে দাঁড়াতে চায় তা হলো– একরাতের জন্য হলেও সে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে বিয়ে দিয়েছিল। এমনই এক বিয়োগান্তক পরিণতি ঘটে নাটকে।

আব্দুল্লাহ আল মামুনের রচিত নাটকগুলোতে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতাকে তুলে না ধরলেও প্রচ্ছন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়কে নির্দেশ করে। এ ধারায় রচিত আব্দুল্লাহ আল মামুনের নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম– 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' (১৯৮৩), 'এখনও ক্রীতদাস' (১৯৮৩), 'তোমরাই' (১৯৮৮), 'বিবিসাব' (১৯৯১), 'মেহেরজান আরেকবার' (১৯৯৮) ইত্যাদি। মামুনুর রশীদের 'জয়জয়ন্তী' (১৯৯৫) নাটকে ফুটে ওঠে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধার সামাজিক সংঘাত। এস এম সোলায়মানের 'এই দেশে এই বেশে' (১৯৮৮) রাজাকারদের কার্যকলাপ, সামাজিক বিন্যাস ও রাজনীতিকে নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে বিদ্রুপ করা হয়েছে। তাঁর 'কোর্ট মার্শাল' (১৯৯৩) নাটকটি হিন্দির রূপান্তর হলেও মুক্তিযুদ্ধের করুণ অমানবিক বাস্তবতা মৌলিক রচনার মতোই বিধৃত।

নাসিরউদ্দীন ইউসুফ রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক– 'একাত্তরের পালা', 'ঘুম নেই', 'টিটোর স্বাধীনতা'। 'ঘুম নেই' নাটকে ফুটে ওঠে– যে রক্তের বিনিময়ে জন্মভিটা আজ স্বাধীন হলো; সে ভিটায় যখন মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই নিষ্পেষণের শিকার হতে হয়, তখন ঘুম না থাকাই স্বাভাবিক। অস্তিত্বহীনতার এ যন্ত্রণা প্রকাশ করবে কীভাবে! এ যেন মুক্তিযুদ্ধ নতুন রূপে উপস্থাপন।

নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক বলেন, এই নাটকের বীজ আমি পেয়েছিলাম একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাস্তব একটি ঘটনা থেকে কিন্তু সেই ঘটনা ঠিক কোথায় ঘটেছিল তা আজ শনাক্ত করতে পারব না। এমন ঘটনা বাংলাদেশে সেদিন প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই ঘটেছিল বলে আমরা দেখতে পাব; আমরা দেখতে পাব যে, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যারা সহায়তা করেছিল তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত ঐ হানাদার বাহিনীরই শিকারে পরিণত হয়েছিল (গ্রন্থযুক্ত ভূমিকা)।

'ঘুম নেই' নাটকের কাহিনি মূলত মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিগাথা। মুক্তির জন্য, সমাজ-জাতি-রাষ্ট্রকে মুক্ত করার জন্য যে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল একসময়, সে মুক্তিযোদ্ধাকেই প্রতিনিয়ত শঙ্কা, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। ঘুম নেই তাদের চোখে। নাটকটি 'বাচ্চু' নামধারী চরিত্রটির জবানিতে বর্ণিত। এ 'বাচ্চু' চরিত্রটি আর কেউ নন– বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকার নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু নিজেই। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অস্তিত্বহীনতার শঙ্কা এ স্মৃতিকথার গভীরে।

নাটকে স্থান পায়– রুমি, মানিক, বদি, সমর, গোলাপ, রহিম, রমিজ, টিটো, জাকির, বেলায়েত, নজরুল প্রমুখ শহিদদের স্মৃতি।

মান্নান হীরার 'একাত্তরের ক্ষুদিরাম', 'লাল জমিন' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনবদ্য নাটক। 'একাত্তরের ক্ষুদিরাম' নাটকটি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। গ্রামের এক শিক্ষক দেশপ্রেম জাগাতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শহিদ ক্ষুদিরামের জীবনীনির্ভর নাটক মঞ্চস্থ করতে যান। সেই প্রেরণা থেকেই একদল কিশোর শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর কীভাবে দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে চলে এ নাটকে তাই দৃশ্যমান। অপরদিকে 'লাল জমিন' নাটকটি মোমেনা চৌধুরীর একক অভিনয়ে উপস্থাপিত। দেশের নানা জেলাসহ বাইরের বিভিন্ন দেশেও নাটকটি প্রদর্শিত হয়। নাটকের কাহিনি একটি কিশোরী মেয়ের জীবনকে আশ্রয় করে। যে মেয়েটি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কীভাবে তার জীবনের স্বপ্নগুলো তছনছ হয়ে যায় এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কীভাবে তাকে বেঁচে থাকার লড়াই করতে হয়– তাই আবেগিক সুরে অনবদ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকগুলোর মধ্যে শামসুল আলম বকুলের 'ঘর লোপাট' ও গোলাম সারোয়ারের 'ক্ষেতমজুর খইমুদ্দিন'ও অত্যন্ত দর্শকপ্রিয়তা পায়। 'টার্গেট প্লাটুন' মামুনুর রশীদের রচনা ও নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি নাটক। এতে পাকিস্তানের শোষণ-নিপীড়ন, মুক্তিযুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতা ও সংগ্রাম ফুটে ওঠে।

২০১২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি *মুক্তিযুদ্ধের নাট্যসংকলন* শিরোনামে দুই খণ্ডে নাট্যগ্রন্থ প্রকাশ করে। প্রথম খণ্ডে তরুণ নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটক ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের নাটক সংকলিত হয়। এ সময় শিল্পকলা একাডেমি 'মুক্তিযুদ্ধের নাট্যোৎসব' শিরোনামে একটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। বিভিন্ন জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্য নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করে। এ উৎসবের নির্বাচিত নাটকও এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। বৃহৎ পরিসরের এ নাট্য সংকলনের নাটকগুলোতে মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে দেখার প্রয়াস রয়েছে।

এ সংকলনের প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে– মান্নান হীরার 'আগুনের ছায়া', দেবাশীষ ঘোষের 'প্রহরী', রুমা মোদকের 'যুদ্ধ ও জয়িতারা', মুন্সি মোহাম্মদ আলি রুমির 'বিজয়ের প্রান্তে', আকবর রেজার 'মেঘের স্বীকৃতি', মাহমুদুল ইসলাম সেলিমের 'মুখোমুখি', ড. পরিমল সরকারের 'বন্ধু নঈমকে খোলা চিঠি', আনন জামানের 'বালিকা ও একটি স্বর্ণপশম ভেড়ার নাট্য', শামীম সাগরের 'সিংহজানির দুঃখগাথা কিংবা পুনর্জাগরণ পালা', হাসান তারেকের 'শিরোমণির ট্যাংকযুদ্ধ, অতঃপর', মাহবুব লীলেনের 'মুক্তিকথন', কামাল উদ্দিনের 'শনি', আল জাবিরের 'মুক্তির প্রতিভাস', শামসুল হাদীর 'সবুজ রক্ত ও এন্টিভাইরাস'।

সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে– মামুনুর রশীদের 'সোয়াত', 'প্রদীপ দেওয়ানজীর 'বধ্যভূমি ফয়'স লেক', আব্দুল্লাহেল মাহমুদের 'এক আসমান খোয়াব', অলোক বসুর 'পেয়ারা বাগান', দেবাশীষ ঘোষের 'ক্ষোভ', রুমা মোদকের '৭১ যুদ্ধ গাথা', তানভীর আহমেদ সিডনীর 'ভ্রু তাং তাং', মাহফুজা হিলালীর 'অসমাপ্ত', বাকার বকুলের 'অতঃপর আমরা', রুমা মোদকের 'জ্যোতিসংহিতা'।

দেবাশীষ ঘোষের নির্দেশিত ঢাকা পদাতিকের নাটক 'কথা ৭১'। মুক্তিযুদ্ধের নির্মম বাস্তবতা এ নাটকের পরতে পরতে উপস্থাপিত। এ নাটকে অপারেশন সার্চলাইট নামে বাঙালি গণহত্যা, ঢাকার জগন্নাথ হল, নিম্নবর্গদের হত্যা, ধর্মান্তরের প্রতিবাদ করায় মসজিদে খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, মুক্তিবাহিনী, মুজিবনগর, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রভৃতির অবস্থা স্থান। অসাম্প্রদায়িক সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে কীভাবে পাকিস্তানি বাহিনী নস্যাৎ করতে চেয়েছিল অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে।

'বরিশালের শব্দাবলি' মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে প্রযোজনা করে 'বৈশাখিনী'। এক বীরাঙ্গনার জীবন দুঃখ নিয়ে নাটকের কাহিনি আবর্তিত। সৈয়দ দুলাল নির্দেশিত এ নাটক বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায় প্রদর্শন হয়। দেবাশীষ ঘোষের আরেকটি নাটক 'পিয়ার চাঁদ'। বীরাঙ্গনা নারীর জীবনগাথা নাটকের পরতে পরতে। বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংগঠনের অর্থায়নে নাটকটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সিলেটের আলোচিত নাটক 'জ্যোতিসংহিতা'। নাটকটি রচনা করেছেন রুমা মোদক। নির্দেশনায় সুদীপ চক্রবর্তী। নাটকটি দেশে-বিদেশে অসংখ্যবার মঞ্চায়িত হয়েছে। বাবুল বিশ্বাসের 'পোড়ামাটি' নাটকটি প্রযোজনা করে পদাতিক নাট্যদল।

'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' শিরোনামে সৈয়দ জামিল আহমেদ মঞ্চে সৃষ্টি করেছেন মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা নারীসত্তার মানবিক অভিঘাত। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে অনেকে মুক্তিযোদ্ধা খেতাবে অভূতপূর্ব সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু নারী মুক্তিযোদ্ধারা কী পেয়েছেন? ধর্ষিতার গ্লানি ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কী জুটেছে? জুটেছে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত জীবন। 'বীরাঙ্গনা' উপাধিও তাদেরকে চিড়িয়াখানার জন্তুতে পরিণত করেছে। নাটকটির কাহিনি গ্রহণ করেছেন নীলিমা ইব্রাহিম রচিত *বীরাঙ্গনা নারীর আত্মজীবনীমূলক গল্পগ্রন্থ* থেকে। এতে মুক্তিযুদ্ধে ৭ জন বীরাঙ্গনার বীভৎস অভিজ্ঞতা থেকে ২ জনের আত্মকাহিনি উপস্থাপন করেছেন। এ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন নারীর প্রতি নির্যাতন, সহিংসতাসহ যুদ্ধোত্তর সময়ে নিগৃহীতের মর্মপীড়া অনবদ্য শিল্প আলেখ্যে নান্দনিক কুশলে উপস্থাপিত

হয়েছে। সৈয়দ জামিল আহমেদ বরাবরই মঞ্চে ইঙ্গিতময় বাস্তবতা নির্মাণ করেন। এ নাটক তার ব্যতিক্রম নয়। আলোর নানা অর্থ যেমন আবেগের গভীরতাকে উসকে দেয় তেমনি মিউজিকের অনবদ্যতা হৃদয়ের অতলকে নাড়া দিয়ে যায়। গল্পকথনের সুরে দৃশ্যনির্মাণের অলংকরণে ভালো লাগা ছুঁয়ে যায়। সংলাপ প্রক্ষেপণ, বিশ্বাসযোগ্য চলন, শারীরিক ভঙ্গি, অভিনয়ের যুগপৎ সম্মিলনে অনবদ্য। আসলে বীরাঙ্গনা যে বারাঙ্গনা নয়– সেটিই এ নাটক বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে।

তবে করোনাকালে কিছুদিন নাট্যচর্চা প্রায় বন্ধই ছিল। তাছাড়াও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতেই বঙ্গবন্ধুর জীবনীনির্ভর নাটক নির্মাণ করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ জুলাই-এ সংগঠিত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের বোধকে আশ্রয় করলেও ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রবণতায় নাট্য নির্মাণগুলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও চেতনার মূলভিত্তি হিসেবে ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নির্মিত নাটকগুলোতে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ভয়াবহতা, ত্যাগের মহিমা এবং রাজাকার-আলবদরদের নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরেছে। মঞ্চনাটক কেবল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দেওয়ার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ হলো– মুক্তিযুদ্ধের এই অবিনাশী চেতনাকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধকে রাজনীতিকরণ, দলীয় রাজনীতির বিষবাষ্প, সাম্প্রদায়িকতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে নাট্যচর্চাকে আরও বেগবান করা। 'বাংলা' ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা বাংলাদেশি জাতিসত্তা তবেই আত্মপরিচয়ে বিশ্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

আবু সাঈদ তুলু: নাট্যকার

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেন, স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান সবক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়নি। এ বিষয়ে সকলকে আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। তিনি নির্দেশ দেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে এলে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। তিনি ১৮ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ নির্দেশ দেন।

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যেখানে তরুণসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তিনি একাত্তরের রণাঙ্গনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান, সে সময় বাঙালিরা বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েও অসীম সাহসিকতায় স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপুলসংখ্যক ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনী একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল, আর জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখেই তাদের পরাজয় ঘটে। সভায় মন্ত্রী কর্মকর্তাদের সময়ানুবর্তিতা, পেশাগত নিষ্ঠা ও সেবামুখী মনোভাব নিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দেন।

প্রতিবেদন: অর্ণব বিশ্বাস

সত্তরের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ

জাফরুল আহসান

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সুবাদে বাঙালি জাতির মানসপটে সত্তর দশক এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে বিশেষ স্থানজুড়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সত্তর দশকে যে একঝাঁক তরুণ কবি কবিতার ভুবন চষে বেড়িয়েছে, সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে এত কবির আবির্ভাব অন্য কোনো দশকে খুঁজে পাওয়া ভার। সংগত কারণেই বলা যায়, সত্তর দশকের কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় অধ্যায়।

বিষয়-বৈচিত্র্য, কবিতার প্রকরণগত দিক, কবিতার দর্শন, উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার সবকিছু মিলিয়ে কবিতার নন্দনতত্ত্ব মাটি ও মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সত্তর দশকের কবিতা; কাব্যভাষার গুণে চিহ্নিত হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়।

সত্তর দশকের কবিরা ১৯৬৯– এর গণ-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে; প্রত্যক্ষ করেছে মুক্তিযুদ্ধ। স্বভাবতই সত্তর দশক স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দশক তথা বিজয়ের দশক। তাই সত্তর দশকের কবিরা আধুনিক বাংলা কবিতায় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ তথা বিজয়কে তুলে ধরেছেন নানাভাবে। আধুনিক বাংলা কবিতাকে পুষ্পিত করেছে, মহিমান্বিত করেছে কাব্য ভাণ্ডার; কারুকার্যময়-শিল্পময় হয়েছে কবিতার চারণভূমি। এ প্রসঙ্গে কবি শিহাব সরকারের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

> বাংলাদেশের সত্তর দশকের কবিতা পুরো বাংলা সাহিত্যের নিরিখে এক তুলনাহীন অধ্যায়।
>
> এ রকম কবিতামগ্ন এবং সৃষ্টিশীল সময় বাংলা সাহিত্যে আর আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের পর পর বাংলাদেশের সাহিত্যে আসা সত্তরের কবিদের ছিল এক অনাস্বাদিত কণ্ঠ। কী আঙ্গিক, কী বিষয়বস্তু বা ম্যাসেজ– কোনো দিক দিয়েই এঁদের কবিতায় পরবর্তী কবিদের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁরা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সন্তান। এঁরা স্বপ্ন দেখতে দেখতে সাহিত্যে এসেছেন। এই স্বপ্ন কখনো নারী, কখনো সমাজ বা মাটি মানুষকে নিয়ে। কারো কারো স্বপ্ন ভঙ্গও হয়েছে। স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ভঙ্গ নিয়ে এঁদের রক্তিম হৃদয়গ্রাহী উচ্চারণের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে নেই আর বাংলাদেশের কবিতার সত্তর দশক এক বড়ো ধরনের বাঁক। সত্তরের কবিরা সম্পূর্ণ পৃথক এক প্ল্যাটফরম তৈরি করেছেন। বড়োকথা একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে উপলব্ধি করা যায়, সত্তর দশকের কবিরা বাংলাদেশের কবিতায় এক রেনেসাঁর মুখ খুলে দিয়েছিলেন, যার পতাকা বয়ে নিয়ে চলেছেন পরবর্তী কবিরা।

(তারেক মাহমুদ সম্পাদিত শিল্প সাহিত্য ও সমাজচিন্তার সাময়িক পত্রিকা *পথিক* বইমেলা ২০০০, পৃষ্ঠা ১০)

উপরোক্ত বিষয়ালোকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিমালা উদ্ধৃত করছি:

০১.

যে কুড়েঘরের চালগুলি বহুদিন শুনেছে যুদ্ধবিমানের গর্জন
যে কুড়েঘরগুলি বর্ষারাতে কান পেতে শুনেছে মর্টারের শব্দ
যে কুড়েঘরগুলি উঠোনে দাঁড়িয়ে খড়ের গাদার পাশে শুনেছে লাজুক কিষাণির আর্তনাদ।
যে কুড়েঘরগুলি জ্যোৎস্নারাতে দেখেছে চকচকে বন্দুকের

নল এই শাদা ফুল একাত্তরে হারিয়ে যায় ছেলের প্রত্যাবর্তনের আশায় খুলে রাখা
হাহাকার মায়ের দরোজা
[নির্মিত কহলারে যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশে/আবিদ আজাদ]
০২.
সেই যুদ্ধ থেমে গেছে
যুদ্ধ থামে, আবার যুদ্ধ নামে বাংলায় একটি ট্রিগার আজ হাওয়ায় হাওয়ায় খোঁজে সম্পন্ন আঙুল
[বাংলাদেশ/আবু করিম ।]
০৩.
আমার নীলিমা
ছিঁড়ে গেছে ক্রুর শকুনির চিৎকারে;
কবলিত চাঁদে বুটের প্রতাপ,
বেয়নেটে বেঁধা নিহত তারার
শব পড়ে আছে বধ্যভূমিতে,
নীহারিকা পাকসেনার শিবিরে বন্দী... এখন হবে না কারো সাথে কোনো সন্ধি।
[প্রতিরোধ/আবিদ আনোয়ার ।]
০৪.
কোনো খানাখন্দে পড়ে ছিল তোমার লাশ
নাকি আছো কোনো অজ-পল্লীর করুণা ও স্নেহে ভেজা ছায়া নিবিড় একলা করবে।
[শুধু তুমি আস নাই/ শিহাব সরকার ।]
০৫.
লাখো ঠোঁটে মুখে দুই হাত তুলে তাই
স্লোগানে কাঁপাই আকাশের পুরোটাই
রাত পোহানোর শেষে আজ ফিরে চাই আগুনে পাকানো ভোরের সূর্যটাই।
[চাই/আতাহার খান]

সত্তর দশকের কবিরা কবিতায় একটা সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধ ভুবন তৈরি করে নিয়েছেন যা অন্য যে-কোনো দশকের কবিতা থেকে সহজেই আলাদা করে নেয়া যায়। কবিতায় প্রকৃতি উঠে এসেছে দেশমাতৃকার রক্ষাকবচ হিসেবে। কবিতার শরীর নির্মিত হয়েছে ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। গেরিলা যুদ্ধে ব্যবহৃত শব্দাবলি কবিতার প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সামাজিক অস্থিরতা আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দোলাচল ছিন্ন ভিন্ন করে কেবলি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কবির চিত্ত ব্যাকুল হতে দেখি। বিষয় বৈচিত্র্যের বিপুলতা পাঠককে কবিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে; পাঠক আস্বাদ করেছে সত্তরের কবিতার স্বাদ।

০১.
গেরিলারা খুঁজে পেয়েছে ছিন্ন ভিন্ন শরীর এলোমেলো চুল, রক্তাক্ত পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা
গরিলারা ওর মুখ চেনে নাই পরিত্যক্ত বাংকারে জননী বঙ্গভূমি শুয়ে আছে।
[যুদ্ধ ৭১/আলমগীর রেজা চৌধুরী]
০২.
শহরে শহরে মুক্তিসেনার ডাক শোনা যায় রাজাকার যত এই দেশে আছে বিচার হবে যে আজ বিচার হবেই খুনী যত আছে এই বাংলায় দিকে দিকে তাই মুক্তিসেনার কণ্ঠে এই আওয়াজ।
[স্বাধীনতা স্বাধীনতা/ইকবাল আজিজ]
০৩.
আজ পাখিরাও জানে পাখার চকিত শব্দে জলভূমি মুখর হলে শিকারীর বন্দুকের নল কি করে ঘুরে যায় লক্ষ্য সন্ধানে
[স্বাধীনতাঃ হে আমার সফেদ মানব/ওয়াহিদ রেজা ।]
০৪.
ভুল ইতিহাসে আপাদমস্তক ডুবে আছ বলে
সব গল্প তোমাদের সাজানো কাহিনি মনে হবে
অসম্ভব অলীক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হবে;
অথচ দেখছি আমাদের অসহায় ভাই পড়শি স্বজন
আমাদের বোন-মায়েদের মেয়েদের লুণ্ঠন করেছে যে কোন সময় দুর্বৃত্তেরা পিশাচেরা-মুষ্টিমেয় কুলাঙ্গার দল সহযোগে রক্ত-উৎসবে মেতেছে নৃশংস হত্যায়।
[বধ্যভূমি/ফরিদ আহমদ দুলাল ।]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বলতে ভাঙ্গা-গড়ার মাঝখানে এক অস্থির সময়কেই বোঝায়। স্বাধীনতার বিশাল প্রত্যাশার পাশাপাশি স্বপ্নভঙ্গ কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছিল বলেই সত্তর দশকের কবি ও কবিতা বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ প্রসঙ্গে সত্তরের কবি মাহবুব হাসানের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

সাত-এর কবিরা স্বাধীনতার মর্মোজ্জ্বল চেতনায় এতটাই কাতর হয়েছিল যে দেশ ও মৃত্তিকা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম ও স্বাধীনতা, দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা কবিদের অন্তর-আত্মা দখল করে নেয়। অন্যদিকে যারা ছিলেন কবিতা যাত্রায় নিপুণ কারিগর, নিসর্গ, প্রকৃতি, মানুষ ও তার পরিবেশ-প্রতিবেশের নিগূঢ় পাঠক, সেইসব কবি নীরবে সৃষ্টি করে চলেন কবিতার বর্ণমালা। জনজীবনে দুটি অংশ লোকজীবন অর্থাৎ গ্রামীণ জীবন ও নগরজীবন উভয় পরিপ্রেক্ষিত নানা প্রতীকে, রূপকে নানা বোধের আকারে নির্মিতি পেতে থাকে সাত-এর কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে সাত-এর কবিরা 'যুদ্ধের কবি' হিসেবে War Poet-এর খ্যাতি, মর্যাদা যেমন পেতে পারে, তেমনি কবিতার নতুন বিক্ষান্তর সৃষ্টির জন্যেও।

(হামিদ রায়হান সম্পাদিত কবিতা বিষয়ক ছোট্ট কাগজ *উত্তরপুরুষ* ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০২/পৃষ্ঠা ৬৩)
নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

০১.
দীর্ঘ ম্যুরাল এঁকে আমি কতো স্মৃতি ছুঁয়ে থাকি
বারুদের গন্ধ আর বুলেটের শিসে মাখা ভোর
অন্ধকার রাত আরো গাঢ় হয় শীতের ছোঁয়ায়
ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া দুই পায়ে তুলে দেয় জোর।
[ম্যুরাল ১৯৭১/শাহাবুদ্দীন নাগরী ।]
০২.
ক্র্যাচে ভর দিয়ে যে যুবক হাঁটে রাজপথে খোলাচুল ওড়ে যার

০১.
আমার হাতের মুঠো থেকে টগবগে ঘোড়ার মত চলছে ছুটে একটি গ্রেনেড। [গ্রেনেড/মাহমুদ শফিক]
০২.
তখন চোখে ভাসছিলো মুক্তি রণাঙ্গন থেকে স্বাধীনতায় ফেরার পালা সদ্যমুক্ত টাঙ্গাইলের দিকে দে দৌড় বলে ছুটেছিলো কিশোরের মন তোর কাছে কি ছিলো স্টেন গান? নাকি ভালোবাসার কোমল মল্লিকা? [টগর তোর স্বাধীনতা/মাহবুব হাসান।
০৩.
আমাদের প্রিয় অপূর্ব স্বপ্নেরা বসে আছে হুইল চেয়ারে ভোরের আকাশ জুলা লাল মোরগ টায়রা কেটে কেটে আমাদের জীবনের মহান শহীদ মিনারের দিকে আসছে নিঃশব্দে।
[পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার জন্য/ জাহিদ হায়দার।]
০৪.
অনেকেই আসে, আসে না কেউ কেউ কেউ হাসে ক্রন্দনে মূর্ছা যায় কেউ এই তো যুদ্ধজয়, এইতো স্বাধীনতা অনেকেই ফিরে আসে, অনেকেই ফিরে না কখনো।
[যুদ্ধশেষের গল্প/ফারুক নওয়াজ।

খরতপ্ত প্রবল বাতাসে
তো সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি আমাদের পঙ্গুতায় অসহায়।
[ক্র্যাচের যুবক/কামাল চৌধুরী।]
০৩.
কবিতারা আজ মুক্তিযোদ্ধা দেশ প্রেমিকের হাত রাইফেল ট্রিগারের বাঁটে টোকা হয়ে ফোটে শত্রুর বুকে রক্ত ঝরায়।
[একাত্তরের কবিতা/বিমল গুহ]
০৪.
চন্দ্রে লেগেছে ঘৃণার গ্রহণ
তারকার ক্রোধ লাল পিঁপড়ের ঝাঁক ব্যর্থ ক্লান্ত ঐ পতাকার রক্ষক বলে
ধু ধু হতাশায় ফুঁসছে একাকী আজ।
[জ্বলুক ক্রুদ্ধ ক্লাউন জ্বলুক/নাসির আহমেদ।

যুদ্ধের নির্মম কষাঘাত, প্রশ্নবিদ্ধ স্বকাল, আর স্বাধীনতাকামী সাড়ে সাত কোটি জনতার মনের তীব্র বাসনাকে পুঁজি করে সত্তরের কবিরা রণাঙ্গনে ছুটে বেরিয়েছেন নয়টি মাস। ক্ষুধা, হতাশা আর চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও মূল্যবোধ আর নৈতিকতা ছিল পাহাড়সম সুদৃঢ়, তাই সত্তরের কবিতায় বারবার ঘুরে ফিরে মুক্তিপাগল মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধের চিত্র দেখতে পাই। স্বজন হারানোর বেদনায় শোকে পাথর হয়েও নিমিষেই শোককে শক্তির হাতিয়ার হিসেবে গর্জে উঠতে দেখি সত্তরের কবিতায়। সর্বদাই যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মুক্তির গান। উদাহরণ হিসেবে নিম্নের উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরছি—

আগেই বলেছি সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় সত্তর দশকের কবিদের একটা ভিন্নতর প্ল্যাটফরম তৈরি করে দিয়েছিল, দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল শক্ত ভিতের উপর। আবেগ, যুক্তি, চিন্তা ও চেতনা সত্তরের কবিতায় যোগ করেছে এক বিশেষ মাত্রা, কাঠামোগত দিক থেকে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কবিতা হয়েছে সমৃদ্ধ, অবস্থান করে নিয়েছে বিশাল ক্যানভাস জুড়ে। ফরিদ আহমদ দুলাল সম্পাদিত পত্রিকা 'স্বতন্ত্র' বৈশাখ-পৌষ সংখ্যা ১৪১৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় 'বাংলাদেশে কবিতার সত্তর দশক' শিরোনামে ফরিদ আহমদ দুলাল লিখেন—

> সত্তরের কবিতা স্বাধীনতা উত্তর অস্থিরতা-স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছেন। প্রত্যেক সচেতন কবিই প্রত্যক্ষ করেছেন কীভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ের আবর্তে পুনর্বাসিত হয়েছে একাত্তরের পরাজিত শক্তি। যাদের চেতনায় এতসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুষঙ্গ হয়ে তোলপাড় করে, তাদের কবিতার বিষয়, মেজাজ ও বাক্যবন্ধ বৈচিত্রপূর্ণ হবে- অনেক বেশি সাহসী হবে- সে কথা তো বলাই বাহুল্য। সত্তরের কবিতা হবে তেজদীপ্ত-ঋজু ও অহংকারী। স্পর্ধা ও অহংকারের উড্ডীন পতাকা হয়ে প্রতিবাদমুখর হবে সত্তরের কবিদের চেতনার জগৎ সাধারণভাবে এমনটিই আশা করা যায়; কিন্তু সত্তরের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখি দ্রোহের চেয়ে প্রণয়ের আকুলতার আধিক্য, প্রতিবাদের চেয়ে সন্ধির আকাঙ্ক্ষা সেখানে প্রবল।

(স্বতন্ত্র/বৈশাখ-পৌষ সংখ্যা ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/পৃষ্ঠা ৭)

দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা তুলে ধরছি।

০১

পরিচয় লোটে ঘাতকের দল এখনো পাকায় লেজ
বিজয়ের মুখ কোনো গ্লানিময় পাইনি সদোত্তর
ভাইকে রেখেছি বোনকে রেখেছি দেখবে নতুন কাল
কেমন ছিলো শহীদের মুখ, মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর।

[মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর/ফারুক মাহমুদ।]

০২.

ওগো পথিক, চোখ ফেরালে দেখতে পেতে ধূলোর মালা, কণ্ঠে ধরে মলিন সুরে একলা রাতে অহর্নিশি খুঁজছে সেকি, নিজ ভুবনে আপন ঘর যুদ্ধ শেষে কিইবা পেলো! স্বাধীনতার এ কোন বর।

[যুদ্ধ শেষে/জাফরুল আহসান।

০৩.

পুড়িয়ে দে শালাদের ঘরবাড়ি গুলি করে মার
যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের হুরপরী হাদিসে হালাল
অতএব ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আয়, এতে পাপ নেই।

[গোলাম আযমের গল্প/সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল।]

সত্তরের কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তাঁদের কবিতায় মুক্তিসেনা, রাজাকার, কমরেড প্রহরী, বিজয়বার্তা, শত্রুশিবিরের নির্মমতা উঠে এসেছে সাবলীলভাবে। সবকিছুই কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। কবিকণ্ঠে উচ্চারিত সম্ভাবনার বাণী মুগ্ধ করেছে পাঠককুল। আপন মহিমায় কবিতা জায়গা করে নিয়েছে পাঠকচিত্ত। এখানে বলে রাখা প্রাসঙ্গিক যে চলমান চালচিত্র কবিতার মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি বরং কবিতা হয়ে উঠেছে সাবলীল। শুধু কি তাই? মুক্তিযুদ্ধের কবিতায় যেন নতুন করে উঠে এসেছে বাংলার জনপদ। নিম্নোক্ত কবিতার উদ্ধৃতি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

০১.

অনেক প্রভাত পেরিয়ে এসেছে এই বাংলাদেশ
তবু আমার আকাশ আজ শকুনের পাখার ছায়াতে
আমি টানটান উত্তেজনা কেন এখনো বইছি
কে যেন আমাকে বলে জেগে থাকো
আমি জেগে আছি-সীমান্তে আমার চোখ জেগে আছে।

[সীমান্তে আমার চোখ জেগে আছে/জাহাঙ্গীর ফিরোজ।]

০২.

ওদের অস্ত্র তখন নির্বিচারে হত্যা করে চলছিলো আমার স্বজনদের
ওদের অস্ত্র এমনই যা দিয়ে রচিত হয় ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়
আর আমার অস্ত্র তৈরি করে বিজয়গাথা, নতুন ইতিহাস
ওদের অস্ত্র যখন বন্দিশিবিরে পরিণত করে তোলে সমগ্র স্বদেশ
আমার অস্ত্রে তখন বেজে ওঠে মুক্তির গান।

[আমার অস্ত্রে বেজে ওঠে মুক্তির গান/জরিনা আখতার]

০৩.

এরপরও আমি হতাশ নই
কবিতার সত্যকে পৃথিবীতে কোনো দিন কোনো রাজা হত্যা করতে পারে নি
একশত বছর পর হলেও মুক্তিযুদ্ধের কবিতাটি লেখা হবে।

[মুক্তিযুদ্ধের কবিতা/মাশুক চৌধুরী]

সত্তরের কবিতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তরুণদের মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈরাজ্য-নৈরাশ্য, সন্ত্রাস অক্টোপাসের মতো গ্রাস করেছিল পুরো সমাজব্যবস্থাকে। এর প্রভাব কখনোবা প্রবলভাবে কিংবা সূক্ষ্মভাবে কবিতার উপর ভর করেছে। জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাসমূহ কবি হৃদয়ের বেদনাবোধকে শতধারায় জাগিয়ে তুলেছে। প্রতিদিনের নানা টানাপোড়েন, জাল-জটিলতা, প্রেম-অপ্রেম, ভান-ভণ্ডামি, আনন্দ-বেদনা সাবলীলভাবে উঠে এসেছে কবিতায়। এ প্রসঙ্গে কবি মুজিবুল হক কবীরের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনা হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে। একাত্তরে আমরা দেখেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তাণ্ডব, আল-বদর, রাজাকারদের জঘন্য, নগ্ন, ভয়ঙ্কর, ব্যাঘ্র থাবা বধ্যভূমি, গোলাবারুদের স্তূপ, রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত, দগ্ধ স্বদেশভূমি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন দশকের কবিদের-লেখকদের বদলে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে কবিতাকে; গল্পের চেহারাকে সেই সঙ্গে বদলে গেছি আমরা সাধারণ মানুষও। একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, স্বদেশ-স্বাধিকার, অঙ্গীকার, প্রত্যাশা মিলে মিশে একাকার হয়ে তীব্র আবেগ-অনুভূতি, হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে নতুন চিত্রকল্প, শব্দ ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে সত্তরের কবিতায়।

এছাড়াও রয়েছে অনেক উল্লেখযোগ্য কবির কবিতা যা কিনা নতুন অর্থ ব্যঞ্জনায়, শব্দ দ্যুতিতে জ্বলে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ সত্তরের প্রত্যেক কবি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতায় চিত্রিত করেছেন। কবিতার প্রতিবেশ, আবহ নির্মাণে শব্দরাশি নানা অনুষঙ্গ, বাহী হয়ে ছন্দিত রূপে ফুটে উঠেছে। শব্দ যেন চারিয়ে দিয়েছে কবিতায় কবির অন্তর্গত বোধ ও উপলব্ধিকে, হৃদয়িক আবেগকে মুক্তযুদ্ধ, স্বাধীনতা, বাংলাদেশ যেন ছন্দময় আশ্চর্য এক ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে।

(হামিদ রায়হান সম্পাদিত কবিতা বিষয়ক কাগজ *উত্তরপুরুষ* ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০২/পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৫৮)

দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ তুলে ধরছি-

০১.

এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী
স্বাধীনতা একি তবে নষ্ট জন্ম? একি তবে পিতাহীন

জননীর লজ্জার ফসল।

[বাতাসে লাশের গন্ধ/রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ।]

০২.

এখানে-ওখানে বনে ও বাদাড়ে জলে ও ডাঙ্গায় লাশের বহর, আকাশ বিহারী শকুন-শকুনীর মহোৎসব কঠিন হৃদয় শোকের পতাকা পুড়িয়ে ফেলেছে আজ তার যুদ্ধযান সাহসী পা পঙ্গুতা ও ঘুনপোকার শিকার

[মুক্তিযোদ্ধার গল্প/মুজিবুল হক কবীর।]

০৩,

বাংলাদেশ তুমি এক অত্যাশ্চর্য ফুল লক্ষ প্রাণ রক্ত ঢেলে ঢেলে সতেজ করেছে এই পাপড়িগুচ্ছ পতাকায় রক্তসূর্য ঝলোমলো দীপ্যমান এই পর্বে ঝরেছে অনেক প্রাণ লেগেছে সময় বাংলাদেশ তুমি এক উত্তুঙ্গ পাহাড় উপত্যকা তৃষিত পাণ্ডুর, পাথরের মধ্যে জ্বলো তুমি স্থির কিন্তু বহে চলো, আকাশের অসীম উড়ালে...

[অদম্য অপরাজেয়/হাসান হাফিজ।]

একথা সত্য রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যখন সমর যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক তখুনি সত্তরের কবির কলম জনতার আক্রোশের মতোই ফুসে উঠেছে। সত্তরের কবিতায় শহর-বন্দর-গ্রাম উঠে এসেছে কবিতার বিষয়বস্তুর চাহিদানুযায়ী। সত্তরের কবিতা আপোশহীন। আমাদের চিরচেনা প্রকৃতি সত্তার কবিতার বিশাল ভূখণ্ড দখল করে আছে। প্রকৃতি হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের দুর্গ। কখনো কখনো কাব্যিক আবেদনের নিয়মাবলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে কবিতা হয়ে উঠেছে বক্তব্য নির্ভর। মোদ্দাকথা সত্তরের কবিদের কবিতা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রসঙ্গক্রমে কবিতার উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরছি–

০১.

চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ; পরিয়াযী পাখির মতোই মুক্তবুদ্ধি দ্রুত এইবার ছেড়ে দেই খোলা ময়দানে এভাবেই বিজয়ের সাথে জয় শব্দটিকে মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিবুদ্ধিকে সমার্থক করি। [মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিবুদ্ধি/মাহমুদ কামাল]

০২.

মনে আছে কি নদী পার হয়ে ঘন দেবদারু বন, মরুভূমি শ্মশানপথ, এইভাবে বিরহসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম লাশের স্তূপ দেখতে দেখতে শহর ছেড়েছিলাম।

[মনে আছে কি/হালিম আজাদ।]

০৩.

যে রক্ত কনিকার ভিতরে ছন্দ আছে সে ছন্দের আরেক নাম স্বাধীনতা, মুক্তি... আর এভাবেই তোমার রক্তের অনুভূতিতে খুঁজে পাবে আমাকে।

[প্রেম/১৯৭১/ফজলুল কাশেম।]

০৪.

দাউ দাউ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইনও পুড়ল জীবনের কথিত সঙ্গায় শংকিত শৃগাল বধ্যভূমিতে খুবলে খেলো আমাদের স্বজনের আলোকিত দেহ-জলপাই রঙ ট্যাঙ্ক এসে বসলো শহরে।

[ক্রুশবিদ্ধ চোখে দেখা/নাসরীন নঈম]

তবে উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরা পঙ্ক্তিমালাসমূহ সত্তরের কবিতায় কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ উপস্থাপিত হয়েছে তার একটা স্বচ্ছ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সত্তরের কবিরা তাঁদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের কাব্যকলার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শত ধারায় উৎসারিত।

সত্তরের কবিরা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই যুদ্ধের উত্তাপ স্পর্শ করেছে কবিচিত্ত। কবির কলম হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার। প্রতিটি কবিতা অনুপ্রাণিত করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের, দৃঢ় করেছে মনোবল দেশ মাতার মুক্তির প্রতিজ্ঞায় কবিতা উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। মনে হয়েছে এক একটি কবিতা যেন এক একজন লড়াকু সৈনিক। কবিতায় উঠে এসেছে জনপদের ভাষা, আগ্নেয়াস্ত্র, আর নির্মম চিত্র, পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের নকশিকাঁথায় রং-বেরঙের সুতোয় বর্ণিল কারুকাজে উদ্ভাসিত মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রাণবন্ত করেছে কবিতাকে।

সত্তরের কবিরা তাঁদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা যেমন সর্বজন স্বীকৃত তেমনি সত্তরের কবিতায় যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ কবিতাকে আলোকিত করেছে তা অন্য কোনো দশকের কবিতায় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। সংগতকারণে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সত্তরের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী কাব্যভাষাকে বদলে দিয়ে একটা স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে।

মো. জাফরুল আহসান: কবি ও সাহিত্যিক

একুশে বইমেলা উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান 'অমর একুশে বইমেলা ২০২৬' উদ্বোধন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীসহ অতিথিরা বইমেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন ঘোষণার পরপরই সর্বসাধারণের জন্য মেলার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য 'বহুমাত্রিক বাংলাদেশ'। ১৫ই মার্চ পর্যন্ত এ মেলা চলে। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা এবং ছুটির দিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে মেলার প্রাঙ্গণ। তবে রাত সাড়ে ৮টার পর প্রবেশ বন্ধ থাকবে। এবারের মেলায় মোট ৫৪৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮১টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৪৬৮টি প্রতিষ্ঠান। মোট ইউনিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ১৮টি। বইমেলাকে ঘিরে যে-কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

স্বাধীনতা ও বর্তমান বাংলাদেশ

জাহিদ ইকবাল

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে শুধু একটি সামরিক সংঘর্ষ নয়; এটি ছিল আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা এবং রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম। দীর্ঘ সময় ধরে চলমান বৈষম্য, সাংস্কৃতিক দমনপীড়ন এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি জাতির সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। ভাষা, সংস্কৃতি, অধিকার ও ন্যায়বিচারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়, যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি প্রমাণ করে যে আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোনো শক্তি দ্বারা দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা যায় না। বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে গভীরভাবে বোঝার জন্য তাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তার পূর্ববর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং পরবর্তী জাতীয় বিকাশের ধারাকে বিশ্লেষণ করা আজ অত্যন্ত অপরিহার্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস মূলত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রায় দুই শতক ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকার পর ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান জন্মায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভৌগোলিকভাবে দুটি অংশে বিভক্ত ছিল– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান, যাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় এক হাজার মাইলের বেশি। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে কুক্ষিগত হয়ে থাকে। প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রায় সব ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল, যা বাঙালির মনে বঞ্চনার বীজ বুনে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের মোট বাজেটের প্রায় ৭০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো, অথচ পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ বা প্রায় ৬৫ শতাংশ অর্জন করত। এই চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরোধ পূর্ব বাংলার অসন্তোষকে আরও তীব্র করে তোলে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা চালায়, যা ছিল বাঙালির সংস্কৃতির ওপর বড়ো আঘাত। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে যখন জিন্নাহ ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', তখন থেকেই প্রতিবাদের দাবানল জ্বলতে শুরু করে। বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার এই লড়াই ছিল মূলত নিজের অস্তিত্বকে রক্ষার লড়াই।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এই আন্দোলন দ্রুত একটি সর্বজনীন গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ বর্বরোচিতভাবে গুলি চালালে বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বারসহ কয়েকজন তরুণ শহিদ হন। এই মহান আত্মত্যাগ সমগ্র জাতিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে এবং বাঙালির জাতীয় চেতনাকে নতুন শক্তি প্রদান করে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে যে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এই আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালির বিজয় নিশ্চিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে জনগণ তাদের গণরায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা স্পষ্ট করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই রায় মেনে নিতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কঠোরভাবে দমন করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়ে এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষোভ জমতে থাকে। এ সময় আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দমনে সরকার নজিরবিহীন দমনপীড়ন চালায়।

পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও উন্নয়ন ব্যয়ের বড়ো অংশ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে। এই পদ্ধতিগত বৈষম্য ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে শক্তিশালী করে। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক পেশকৃত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। এই ছয় দফা দাবিতে ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা, নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা এবং পৃথক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব রাখার কথা বলা হয়, যা তৎকালীন পাকিস্তানের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ছিল সেই সংগ্রামের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। ২০শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের রক্ত আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করার ঘটনাগুলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করে। ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে সামরিক শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং জনগণের সম্মিলিত রাজনৈতিক শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি চরম মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য স্পষ্ট গণরায় প্রদান করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে শাসকগোষ্ঠীর টালবাহানা পরিস্থিতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জোরালো ভাষণ পুরো জাতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির ও স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পরিস্থিতি অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বর্বরোচিত সামরিক অভিযান শুরু করে। শহর ও গ্রামে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন এবং অকথ্য নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর যে বর্বরতা চালায় তা বিশ্ব বিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়। এসময় হাজার হাজার নিরপরাধ বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারায়। সেই রাতেই প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রেপ্তারের শিকার হন এবং পরিস্থিতি চূড়ান্ত যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করে।

এরই প্রেক্ষাপটে শুরু হয় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, যা ছিল একটি সর্বজনীন জনযুদ্ধ। এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে সারা দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরে দুঃসাহসী সামরিক কমান্ডাররা লড়াই চালিয়ে যান। ১ নম্বর সেক্টর ছিল চট্টগ্রাম এলাকা নিয়ে, যার নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীতে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২ নম্বর সেক্টর ছিল ঢাকা ও কুমিল্লার অংশবিশেষ নিয়ে, যা ছিল খালেদ মোশাররফের অধীনে। ৩ নম্বর সেক্টর ছিল শফিউল্লাহর অধীনে।

মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ কৌশল ছিল নৌ-কমান্ডোদের 'অপারেশন জ্যাকপট'। ১৫ই আগস্ট রাতে দেশের বিভিন্ন বন্দরে একযোগে অভিযান চালিয়ে নৌ-কমান্ডোরা পাকিস্তানি বাহিনীর রসদ ও জাহাজ ধ্বংস করে দেয়, যা পাকিস্তানিদের মনোবলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। অন্যদিকে আকাশপথে 'কিলো ফ্লাইট'-এর কার্যক্রম ছিল দেখার মতো। গেরিলা বাহিনী হিসেবে 'ক্র্যাক প্লাটুন' ঢাকার ভেতরে সফল অপারেশন চালিয়ে পাকিস্তানি প্রশাসনকে থমকে দিয়েছিল। সারাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ও আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সীমান্তের ওপারে ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রায় এক লাখ যুবক কঠোর প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে বীর বিক্রমে লড়াই করেন।

মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ভারত প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো

ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের বিজয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যদিও মার্কিন প্রশাসন বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু সেখানকার জনগণ ও বুদ্ধিজীবীরা বাঙালির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদেশের মাটিতে বাঙালি প্রবাসীরা জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে জনমত গঠনে নিরলস পরিশ্রম করেন। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল অনবদ্য।

এই যুদ্ধের মানবিক মূল্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দেন এবং দুই লাখেরও বেশি নারী সম্ভ্রম হারান। প্রায় ১ কোটি মানুষ শরণার্থী

হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। যুদ্ধের ফলে দেশের অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ৯ মাসের লড়াইয়ের পর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে ১৪ই ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধ শুধু সামরিক বিজয় ছিল না; এটি ছিল একটি জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিজয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রশাসন, মিত্র বাহিনীকে ফেরত পাঠানো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো পুনর্গঠনে মনোনিবেশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা এসেছে। কিন্তু নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরায় ফিরে আসে এবং দেশ নতুন উদ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসার পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করতে শুরু করে। স্বাধীনতার পরপরই যে দেশটিকে অনেকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলেছিল, সেই দেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি– যা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রায় ৮০ লাখ পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করেছে। এছাড়াও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বছরে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ২,৭০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি খাতে বাংলাদেশের অর্জন আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ শীর্ষ দেশ। কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সরকারি সহায়তায় সবজি ও ফল উৎপাদনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। স্বাস্থ্য খাতে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৭৩ বছর ছুঁইছুঁই।

শিক্ষা খাতেও বাংলাদেশের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের অংশগ্রহণে সমতা অর্জন

দক্ষিণ এশিয়ায় উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমিয়ে এনেছে। বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বিশ্ববাসীর কাছে বিস্ময়। পোশাক কারখানা থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী ও উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিতে নারীদের সরব উপস্থিতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সমাজ কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তরুণ প্রজন্মের জয়যাত্রা দেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২০২৫ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের তরুণরা এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তবে উন্নয়নের এই গতির পাশে কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। রাজনৈতিক মেরুকরণ, সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি এবং বেকারত্ব এখনো উন্নয়নের সুফল ঘরে তোলার পথে বড়ো বাধা। বাজার দর বা মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে, যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ জরুরি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি নয়; এটি একটি আদর্শ। নতুন প্রজন্মের কাছে এই বীরত্বের সঠিক ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নিরপেক্ষ চর্চা জাতিকে দায়িত্বশীল করে তোলে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে যে ঐক্যবদ্ধ জাতি যে-কোনো বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। উন্নয়নের সুফল যখন সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তখনই প্রকৃত স্বাধীনতার সার্থকতা পাওয়া যাবে। রক্তস্নাত সেই পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সবার নৈতিক ও নাগরিক দায়িত্ব।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশের বীরত্বপূর্ণ অবদান বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর পাশাপাশি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববিবেকের কাছে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ মানবতার জন্য দায়বদ্ধ। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কূটনীতিতে 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'- এই নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বড়ো উৎস এখন শ্রমজীবী মানুষের রেমিট্যান্স।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত আমাদের বর্তমান অঙ্গীকার। মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। এই রক্ষা করার মূলমন্ত্র হলো গণতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন চর্চা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। আগামীর বাংলাদেশ হবে উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন এবং জ্ঞানভিত্তিক একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হবে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জনের জন্য তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় বরাদ্দ বাড়িয়ে বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা এখন সময়ের দাবি। ডিজিটাল বিপ্লবের সুফল কাজে লাগিয়ে প্রতিটি গ্রামকে শহরে রূপান্তর করার যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন না হলে উন্নয়নের সুফল টেকসই হবে না। তাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাই হোক আমাদের আগামীর পথ চলার পাথেয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সেই সমতা, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমাদের সম্মিলিত অভিযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষা, বর্তমান অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন— এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়েই আমরা গড়ে তুলব এক বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ। শহিদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। তাদের আত্মদানের ঋণ শোধ করার একমাত্র উপায় হলো একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় দেশ গড়া। সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অর্থনৈতিক মুক্তিই হোক আমাদের আগামী দিনের মূল লক্ষ্য।

জাহিদ ইকবাল: কবি ও সাহিত্যিক

ভূমিকম্প মোকাবিলায় নতুন পদক্ষেপ নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

ভূমিকম্পের ভয়াবহতা মোকাবিলায় ঢাকা মহানগরীতে ১ লাখ স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ১লা মার্চ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব (দুলু)। মন্ত্রী জানান, ভূমিকম্পের পর প্রাথমিকভাবে আশ্রয়ের জন্য শহরের খেলার মাঠ এবং স্কুলগুলো চিহ্নিত করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ভূমিকম্পের সময় এবং পরবর্তী করণীয় নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারেক রহমান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব (দুলু) আরও জানান, ভূমিকম্প মোকাবিলায় একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে আগামী ১১ই মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিবেদন: শারমিন শান্তা

মুক্তিযুদ্ধে নদী ও নারীর অনন্য ভূমিকা

কামরুন-নাহার-মুকুল

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

এ যুদ্ধ শহরের রাজপথ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেনানিবাসসহ সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধ দেশের আপামর জনগণের যুদ্ধ। তাই এক অর্থে বলা যায়, দেশের প্রতিটি মানুষ ছিলেন এক একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ। গ্রামবাংলার নদী-খাল, ধানক্ষেত ও কাঁচা রাস্তায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিলেন। গ্রামবাংলার জীবন তখন হয়ে উঠেছিল ভয়, ক্ষুধা, প্রতিরোধ ও অদম্য সাহসের এক জটিল সমন্বয়। মানুষের ত্যাগ ও সরাসরি অংশগ্রহণে এক রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। গ্রামবাংলার মানুষ রাজনৈতিকভাবে খুব শিক্ষিত না হলেও তাদের মধ্যে অন্যায়ের ধারণা ছিল স্পষ্ট। তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের গর্ব ও অহংকারের শেষ নেই।

মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন শেষে ভারতীয় উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে অমিল থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় মিলের কারণে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। এরপর থেকে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনা, দমনপীড়ন ও নিপীড়নে একটি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে জমা হতে থাকে। মরহুম মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তান শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। আইয়ুবী শাসনের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনগণের দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে মানুষ আন্দোলনে নেমে পড়ে। রূপ নেয় গণ-আন্দোলনে। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ ঢাকার রাজপথে শাহাদতবরণ করেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নেয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর উদাত্ত আহ্বানে এ দেশের মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন। ভাসানীই একমাত্র জননেতা এবং সাধারণ মানুষের আপনজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সহাবস্থান সম্ভব নয়। তিনি কাগমারী মহাসম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা একক কোনো নেতা বা একক কোনো দলের কৃতিত্ব নয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালির প্রথম অর্জন। বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের হলেও ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও তৎকালীন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দিতে টালবাহানা করে এবং নানা অজুহাতে কালক্ষেপণ করতে থাকে। গ্রামবাংলার মানুষ বিশ্বাস করেছিল, হয়ত শোষণের অবসান হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত করলে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জনগণ রাজপথে নেমে আসে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। শহরে-বন্দরে-গ্রামেগঞ্জে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগানে রাজধানী ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় বর্বর গণহত্যা চালায়। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্রছাত্রী-কর্মচারী নিহত হন। ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হলে পরিকল্পিতভাবে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। তখনকার সময়ের একমাত্র মেয়েদের রোকেয়া হলেও হত্যাযজ্ঞ চালায় হানাদাররা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতের আধারের ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনাকে সাইমন ড্রিং নামে এক অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক ক্যামেরাবন্দী করে ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়। রাজনৈতিক সংকট ও নেতৃত্ব শূন্য পরিস্থিতি দেখা দেয়; পুরো শহরজুড়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। এই সংকট মোকাবিলায় কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ ইথারে ভেসে আসে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা। জনতা আশার আলো দেখতে পায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের সাধারণ মানুষ। কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী যুবক, সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসারসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে দুঃসাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। তরুণরা কলম ছুঁড়ে ফেলে হাতে তুলে নেয় অস্ত্র।

২৫শে মার্চের গণহত্যার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলেও অভিযান শুরু করে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। নদীপথে গানবোট, স্থলপথে সেনা ট্রাক নিয়ে পূর্বসংকেত ছাড়াই গ্রামে ঢুকে যেত। গ্রাম তখন আর নিরাপদ আশ্রয় ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের বড়ো শিকার ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের গ্রামগুলোকে পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করে নিত। পুরুষদের হত্যা করা হতো, তরুণদের ধরে নিয়ে যেত, সন্দেহ হলেই গুলি চালাতো, সম্পদ লুট করে নিত, এবং নারীদের নির্যাতন করা হতো। কোথাও কোথাও পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন ভয় ছড়িয়ে যায় আশপাশের এলাকাতেও। রাত ছিল সবচেয়ে আতঙ্কের সময়। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা মানুষ শুনত দূরের গুলির শব্দ, চোখে দেখত আগুনের লেলিহান শিখা। গ্রামে তখন আলো জ্বালানো, জোরে কথা বলা, এমনকি শিশুর কান্নাও হয়ে উঠত বিপজ্জনক। এ অত্যাচারকে মোকাবিলা করার জন্য গড়ে ওঠে খণ্ড খণ্ড মুক্তিসেনা দল। প্রতিটি গ্রাম হয়ে ওঠে এক একটি দুর্গ।

পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে লাখ লাখ গ্রামবাসী নদী পার হয়ে, হেঁটে, গরুর গাড়িতে করে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছোটে। অনেকে সীমান্তে পৌঁছায়; প্রাণের নিরাপত্তার জন্য ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। জীবন ছিল কষ্টকর, খাবার অল্প, রোগব্যাধি বেশি, তবু সেখানে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থী শিবির থেকেই অনেক তরুণ প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। গ্রামবাংলাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি। শহরের বাইরে গ্রামেই চলেছে গেরিলা যুদ্ধের মূল প্রস্তুতি। বাঁশঝাড়, খাল, চর, ধানক্ষেত কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। গ্রামের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখত, পথ দেখিয়ে দিত, শত্রুর খবর দিত। অনেক স্কুল, মাদ্রাসা, পরিত্যক্ত বাড়ি হয়ে উঠেছিল অস্থায়ী ক্যাম্প। এরই মধ্যে কিছু মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হয়ে গড়ে তোলে রাজাকার, আল শামস ও আলবদর বাহিনী। এরা গ্রামেরই পরিচিত মুখ। তারা সেনাদের তথ্য দিত, নিরীহ মানুষকে ধরিয়ে দিত। ফলে গ্রামবাংলায় তৈরি হয় গভীর বিভাজন। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী। এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষত অনেক গ্রামে আজও ইতিহাসের কালো দাগ হয়ে আছে।

সে সময়ের সবচেয়ে নীরব অথচ নির্মম দিক ছিল খাদ্যসংকট। কৃষিকাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অনেক জমি অনাবাদি হয়ে পড়ে থাকে। কোথাও ফসল পুড়ে যায়, কোথাও সেনারা লুট করে নিয়ে যায়। চালের দাম বেড়ে যায়, বাজার বসে অনিয়মিত। বহু পরিবার একবেলা বা তারও কম খেয়ে দিন কাটায়। শাকপাতা,

কচু, পান্তাভাত, মরিচ পোড়াই ছিল তখন উপাদেয় খাবার। সবচেয়ে কষ্টে ছিল শিশু ও বৃদ্ধরা। কিন্তু ক্ষুধা মানুষকে হার মানাতে পারেনি; মুক্তির নেশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল গ্রামবাংলার মানুষ; জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। কিছু পাকিস্তানি দালাল ছাড়া সবাই যে যেভাবে পেরেছেন মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। কেবল পুরুষই নয়; গ্রামবাংলায় নারীরাও হয়ে ওঠেন নীরব এবং সাহসী যোদ্ধা। অদম্য সাহস ও প্রবল দেশপ্রেমের প্রতীক এদেশের নারীরা। পুরুষের পাশাপাশি অস্ত্র পরিচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পুরুষের বেশে শার্ট-প্যান্ট পরে নারী যুদ্ধে নেমে পড়ে। তাদের অবদান ছিল অপরিসীম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নারী হাসিমুখে সন্তান, ভাই, স্বামীকে যুদ্ধে যাবার প্রেরণা দিয়েছেন। আবার সংসার টিকিয়ে, সন্তান বাঁচিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সহায়তা দিয়েছেন। রাতের অন্ধকারে রান্না করে খাবার পৌঁছে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। পাশাপাশি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করাও ছিল তাদের দায়িত্ব। এরাই গড়েছিলেন গ্রামবাংলার প্রতিরোধের শক্ত ভিত। গ্রামের এক বৃদ্ধা তাঁর একমাত্র সম্বল মোরগটাও জবাই করে ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছেন। সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধ, অস্ত্র সরবরাহ, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, চিকিৎসাসেবা, আশ্রয় দেওয়াসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিতে নারীরা অসামান্য সাহসিকতা দেখিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, গেরিলা নেত্রী ও সহযোদ্ধা। নারী-পুরুষ একসাথে অংশ নিয়েছিল। পুরুষের সহযোদ্ধা হিসেবে নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহস, নির্ভীকতা বাংলাদেশে স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নারীরা শুধু অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন তাঁরা সকল যোদ্ধাদের পরম মমতায় আগলে রেখেছেন, সাহস জুগিয়েছেন। কেউ রাজাকার আর পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। মূলত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল– নারী-পুরুষের সম্মিলিত ধারায় যুক্ত। সমগ্র যুদ্ধে নারী-পুরুষ যার যেখানে যেমন অবদান রাখা দরকার, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা তরুণদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সবাই। কেউ আহত মুক্তিযোদ্ধা বা শরণার্থীদের সেবা করার জন্য হাসপাতালে সেবকের কাজ করেছেন, কেউ গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন মানুষকে। কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে পাকিস্তানিদের নির্যাতনের প্রতিবাদে কলম ধরেছেন। কেউ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। বেতারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচণ্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের পাশপাশি শব্দযোদ্ধাদের কণ্ঠ যুদ্ধ করে গেছে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত। তাদের অস্ত্র ছিল কণ্ঠ, গান আর বাদ্যযন্ত্র। শব্দকে হাতিয়ার করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সূচনালগ্ন থেকে। বহুমুখী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ‘চরমপত্র’ নামে ঢাকাইয়া ভাষায় কথিকা প্রচার হতো। এটি লিখতেন এবং পরিবেশন করতেন সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল। মুক্তিকামী মানুষ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একটি চরমপত্রের প্রথম দুটি বাক্য ছিল ‘ম্যাজিক কারবার। ঢাকায় অহন ম্যাজিক কারবার চলতাছে’। এই কথা বলে ইয়াহিয়া সরকারের লেজেগোবরে অবস্থা তুলে ধরতেন তিনি।

পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশীয় দোসরদের সাথে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চষে বেড়িয়েছে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি বাহিনী নারীর ওপর নিপীড়ন, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটিয়েছে। সেই নারীদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষত ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়। যুদ্ধ শেষে ‘বীরাঙ্গনা’ স্বীকৃতি পেলেও সামাজিক বাস্তবতা তাদের জন্য সহজ ছিল না। এমনকি পরিবারেও স্বীকৃতি মেলেনি।

গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে ‘বাংলাদেশ হাসপাতাল’ স্থাপন করা হয়। এটি ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’ বা ‘বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল’ নামেও পরিচিত ছিল। ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখানে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রকৃতি মুক্তিযুদ্ধের অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে, নদীর অবদান অপরিসীম। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ছিল খুবই পরিচিত এবং এসবের সঙ্গে তাদের সখ্য ছিল খুবই গভীর। হাওর বা নদীতে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে হানাদারদের কাবু করা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এক অন্যান্য কৌশল। পাকিস্তানি সেনাদের এরকম কৌশলের কথা কল্পনাতেও আসেনি। এমনকি নদীতে খালি নৌকা ছেড়ে দিয়ে তার পেছনে গোপনে অগ্রসর হয়ে শত্রুকে নিশানায় এনে ঘায়েল করতেও মুক্তিযোদ্ধাদের বেগ পেতে হতো না। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে বিশেষত বর্ষাকালে নদী ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করে মুক্তিযোদ্ধারা। এ সময় নদীগুলোও তাদের সহযোদ্ধা হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। একাত্তরে একেকটি নদীও ছিল যেন মুক্তিযোদ্ধা। নদীবিধৌত বাংলায় বেড়ে ওঠা দামাল ছেলেরা অস্ত্র হাতে নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে কখনোবা পানিতে ডুবে ডুবে যুদ্ধ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নদ-নদী ছিল অন্যতম অনুঘটক এবং ‘জলযোদ্ধা’। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নদী হয়ে উঠেছিল সহায়ক শক্তি। ১৯৭১-এর রণকৌশল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নদী কেবল একটি জলাধার ছিল না; নদী ছিল একটি ‘অ্যাক্টিভ কমব্যাট্যান্ট’ বা সক্রিয় যোদ্ধা। ২৫ হাজার ১৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌপথ এবং ১ হাজার ২শ ৭৪টি নদীর এই জালটি পাকিস্তানের যান্ত্রিক বাহিনীকে ‘লজিস্টিকল নাইটমেয়ার’ বা রসদ সরবরাহের দুঃস্বপ্নে ফেলে দিয়েছিল। যা থেকে তারা আর বের হতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা স্থলভাগে যুদ্ধ করলেও তাদের ‘নিরাপত্তা বলয়’ বা ‘সেফ জোন’ ছিল নদী। পাকিস্তানি বাহিনীর ভারী আর্টিলারি বা

ট্যাংক এই নদীমাতৃক বাউন্ডারি ক্রস করতে গিয়ে বার বার থমকে গেছে।

নদীপথের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করার জন্য গড়ে তোলেন নৌ কমান্ডো দল। এই দল ১০ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নৌ কমান্ডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ভাগীরথী নদীর তীরে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই নদীতেই মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষদের হত্যা করে ফেলে দিত। লাশ ফেলার নিরাপদ জায়গা ছিল এ নদী। নদীটি হয়ে ওঠে এক রক্তগঙ্গা। তাইতো কণ্ঠশিল্পীরা গেয়ে ওঠেন, 'এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা, আমরা তোমাদের ভুলব না।'

'অপারেশন জ্যাকপট' সবচেয়ে স্মরণীয়। এটি ছিল নৌযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে সফলতম গেরিলা অপারেশন। অপারেশন 'জ্যাকপট' খ্যাত দুঃসাহসিক অভিযানে হানাদারদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। এই অপারেশনের কথা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ফলাওভাবে প্রচার হয়। বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা। একাত্তরের ১৫ই আগস্ট রাতের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রাম, মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে একযোগে অসীম সাহসের সঙ্গে হামলা চালায় নৌযোদ্ধারা। এই গেরিলা অপারেশনে পাকিস্তানি বাহিনীর বেশকিছু অস্ত্র ও রসদবাহী জাহাজ ধ্বংস হয়। তার মধ্যে বিদেশি কিছু জাহাজও ছিল। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর খবর।

একাত্তরে নদী পাকিস্তানের গলার ফাঁস ছিল। তারপরেও বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর তীরে ত্রিশ গোডাউনে পাকবাহিনী প্রধান টর্চার সেল স্থাপন করে। নদী-সংলগ্ন সাগরদী খালের পাড়ে হাজারো মানুষকে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হতো। বরিশালের করুনা বেগম, লতিকা বিশ্বাস, রুনা দাশ ও শোভা রানী মণ্ডল, সম্মুখযুদ্ধ, অস্ত্র সরবরাহ, চিকিৎসা এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হাজেরা বেগম পাকিস্তানি বাহিনীর পাশবিকতার শিকার হয়ে 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

পিরোজপুরে 'ভাগীরথী' নামে এক অসীম সাহসী নারী টুকটাক কাজকর্ম করে দেবার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের শিবিরে আসা-যাওয়া করত। তার উদ্দেশ্য কৌশলে খবর সংগ্রহ করে সেই খবর পৌঁছে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। তার দেওয়া খবরের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধারা সফলও

হন। তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে রাজাকাররা তাকে ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা তার হাত জিপের সঙ্গে বেঁধে দুই কিলোমিটার রাস্তা টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে নির্যাতন চালায়। রক্তে রঞ্জিত হয় পিরোজপুরের সড়ক। তারপর গুলি করে হত্যা করে লাশ ছুড়ে ফেলে বলেশ্বর নদীতে। প্রায় প্রতিদিনই ফজরের আজানের পূর্বক্ষণে পিরোজপুরের কোল ঘেসে বয়ে যাওয়া বলেশ্বর নদীতে গুলি করে লাশ ভাসিয়ে দিত। ঐ গুলির শব্দ যাদের কানে পৌঁছাতো তারা গুনে নিত কত জন লাশ হলো। ঢাকার বুড়িগঙ্গা গণহত্যার সাক্ষী।

কুড়িগ্রামের রৌমারী, নয় মাসজুড়েই ছিল 'মুক্তাঞ্চল'। পাকিস্তানি বাহিনীর সাহস হয়নি 'দুধকুমার' নদীটি পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়ার। সেই সুবাদে ওখানে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা। এই এলাকারই মেয়ে তারামন বিবি স্বাধীনতার পর 'বীরপ্রতীক' খেতাব পান যুদ্ধে অসম সাহসী ভূমিকার জন্য।

সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ মেঘনা নদী। আশুগঞ্জ ব্রিজ উড়িয়ে দেয় পাকিস্তানিরা। ভেবেছিল, ভারতীয় বাহিনী আটকা পড়ে যাবে। কিন্তু জেনারেল সাগাত সিং হেলিকপ্টার ও স্থানীয় নৌকা ব্যবহার করে মেঘনা পার হন। নদীকে বাধা মনে না করে 'মাধ্যম' হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এই কৌশলটাই ঢাকার পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

নদীভিত্তিক যুদ্ধের শেষ অধ্যায়টি ছিল কনভেনশনাল বা প্রথাগত নৌযুদ্ধ। গেরিলা আক্রমণ থেকে বেরিয়ে এসে ডিসেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সরাসরি গানবোট নিয়ে আক্রমণ শুরু করে । যুদ্ধের চূড়ান্তলগ্নে যৌথ কমান্ড এক নতুন কৌশল নেয়, যা পুরোপুরি ছিল নদীর ওপর নির্ভরশীল। একে বলা হয় 'বাইপাস স্ট্র্যাটেজি'।

মুক্তিযুদ্ধ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ শোষণ-বঞ্চনা- নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যুদ্ধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিরোধের যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধ। এটা কোনো বিশেষ শ্রেণি-পেশার মানুষের যুদ্ধ নয়। এটা জনযুদ্ধ; এ যুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। এ যুদ্ধকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে অস্বীকার করা মানে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। যারা ১৯৭১ দেখেছে তাদের চোখের সামনে এখনো ভেসে ওঠে অস্ত্র হাতে বীরপুরুষের অবয়ব আর নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার নারীর মুখচ্ছবি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ এখনও অনেক রহস্যময়। যে বয়সে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিলেন, বর্তমান তরুণসমাজ এখন সে বয়সের। তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুনেছে এবং বইয়েও হয়ত পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের একটা পটভূমি আছে, যাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। মুক্তিযুদ্ধ থেকে মানুষ অনুপ্রেরণা নেয়। তাই তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানাতে হবে। এই দেশ কোথা থেকে আসল, কেন এবং কীভাবে যুদ্ধ হলো। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যত জানবে তত বেশি দেশপ্রেমিক হবে; দেশকে এগিয়ে নেবে। তারুণ্য একটি প্রাণশক্তি, তাদের বর্ণিল স্বপ্নে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের স্বপ্ন। তারাই এখন উত্তরসূরি। তাদের অস্তিত্বে থাকবে বাংলাদেশ।

চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ক্যাথরিন মাসুদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ তো বিশাল এক ক্যানভাস। সে ক্যানভাসে কত না হাজার ছবি ফুটে রয়েছে। সেই ছবিগুলো দেখে নেওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই এখন জরুরি। মানুষ প্রযুক্তির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত। তাই ইন্টারনেটের সামাজিক মাধ্যমগুলোতেও থাকতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধকে জানতে ও বুঝতে এই প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ, চিত্রকর্ম, টিভি চ্যানেল কিংবা চলচ্চিত্রের ওপর যেন আর নির্ভর করতে না হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হয়। এক সময় খাবার টেবিলে যুদ্ধদিনের গল্প করতে করতে খাবারের হাত শুকিয়ে যেত কিন্তু গল্প যেন শেষ হতো না।

বাংলা ভাষার ইতিহাস কেবল শব্দের ইতিহাস নয়। একটি জাতির আত্মজাগরণ, আত্মত্যাগ এবং আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। ইতিহাসের শিক্ষা স্পষ্ট, ভাষা কেবল ব্যবহারের বিষয় নয়, অস্তিত্বের ভিত্তি। আজকের প্রজন্ম অত্যাধুনিক ডিজিটাল যুগে বাস করে। তথ্যপ্রযুক্তি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি নতুন প্রজন্ম ভাষার প্রতি সচেতন না থাকে, তবে তারা ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তথ্যপ্রযুক্তিগত অগ্রগতি থাকলেও জাতির মানসিক ভিত দুর্বল হয়ে যাবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষার কোনো বিরোধ নেই। উভয়ের মধ্যে অপরূপ মিল রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই হানাদারেরা নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছে এবং মানুষ রাজপথে নেমেছে। একাত্তর সাল ছিল স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ আর চব্বিশ সাল ছিল স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। একাত্তরে পূর্ব বাংলার মানুষ শোষণ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। নানা রণকৌশল, প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আর চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন মানুষের অধিকার রক্ষা করার, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে লড়াই। উভয়ের লক্ষ্য একই। ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে একটি দেশ, একটি পতাকা। আর চব্বিশের জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। দুটি একই সূত্রে গাথা। একইভাবে সমুজ্জ্বল। শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশ ভোলেনি, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদেরও বাংলাদেশ কখনো ভুলবে না।

কামরুন-নাহার-মুকুল: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

স্বাধীনতার ৫৫ বছর: স্মৃতি, অর্জন ও আত্মঅনুভূতি

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

আটটার সংবাদের আগে বিটিভির সেই সুর– 'সব কটা জানালা খুলে দাও না...'। সুরটা কানে গেলেই বুকের ভেতর কেমন জানি একটা শূন্যতা আর শিহরন খেলা করত। তখন তো আর স্যাটেলাইট টিভির এই ঝকঝকে দুনিয়া ছিল না। এন্টেনা ঘুরিয়ে ঝিরঝিরে পর্দায় সেই গানটি যখন বাজত, তখন শৈশবের সেই অপরিপক্ব মনেও একটা ঘোর তৈরি হতো। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৫ বছর পার করে সেই সুরটা যখন আবার মনে পড়ে, তখন কেবল জানালার গ্রিল নয়, যেন স্মৃতির আগলগুলোও হুড়মুড় করে খুলে যায়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। একটি বিভীষিকাময় রাত। ইতিহাসের পাতায় একে আমরা 'কালরাত' বলি। কিন্তু যারা সেই রাতটি পার করেছিলেন, তাদের কাছে এটি কেবল ইতিহাসের কোনো পরিভাষা ছিল না। এটি ছিল যমের সাথে পাঞ্জা লড়া। একটি ভূখণ্ড যখন স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নে বিভোর, ঠিক সেই মুহূর্তেই নেমে এসেছিল নরক। পঁচিশের সেই রাতটি ছিল নিস্তব্ধতার বুক চিরে আসা বুলেটের শব্দ। আগুনের লেলিহান শিখা। মানুষের আর্তচিৎকার।

সেই রাতে কী ঘটেছিল, তা আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে জানি। বড়োদের মুখে গল্প শুনে জেনেছি। কিন্তু সেই অনুভবের তীব্রতা কি আজও আমাদের নাড়া দেয়? ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে যখন স্বাধীনতার ঘোষণা এলো, তখন চারদিকে কেবল লাশ আর ধ্বংসস্তূপ। এক দিকে বুকফাটা কান্না, অন্যদিকে নতুন সূর্যের প্রতীক্ষা। ভয় আর স্বপ্ন কীভাবে একই আকাশের নীচে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ছিল, তা ভাবলে আজও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। এক দিকে প্রিয়জনকে হারানোর ভয়, অন্য দিকে শৃঙ্খল ভাঙার অদম্য প্রতিজ্ঞা। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই তৈরি হয়েছিল আমাদের এই বাংলাদেশ।

আজ ৫৫ বছর পর আমাদের সেই বোধের জানালাগুলো কি আসলে খোলা আছে? আমরা কি বুঝতে পারছি, এই যে আজ আমরা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছি, এর প্রতিটি কণা কতখানি রক্ত দিয়ে কেনা? স্বাধীনতা মানে তো কেবল একটি মানচিত্র নয়। স্বাধীনতা মানে কেবল একটি পতাকা নয়। এটি একটি চেতনা। একটি নিরন্তর বয়ে চলা নদী।

আমার ভাবনায় একাত্তর মানে কেবল যুদ্ধের ময়দান নয়। একাত্তর মানে সেই মা, যিনি তার সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দরজায় খিল না দিয়ে সারারাত জেগে থাকতেন। একাত্তর মানে সেই কিশোর, যে নিজের শৈশবকে বিসর্জন দিয়ে হাতে তুলে নিয়েছিল ভারী রাইফেল। তাদের ত্যাগ আর তিতীক্ষার গভীরতা পরিমাপ করার মতো কোনো দাঁড়িপাল্লা আজও তৈরি হয়নি। আমরা যখন আজ উন্নয়নের গল্প বলি, যখন আকাশছোঁয়া অট্টালিকার দিকে

তাকাই, তখন কি একবারও মনে পড়ে সেই মাটিচাপা পড়া হাড়গুলোর কথা, যারা কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই আমাদের এই দেশটা উপহার দিয়ে গেছেন?

কিন্তু আজ যখন চারপাশে তাকাই, তখন এক গভীর বিষাদ বুক চেপে ধরে। যে সাম্য আর ন্যায়বিচারের স্বপ্নে একাত্তরে মানুষ প্রাণ দিয়েছিল, তা কি আমরা রক্ষা করতে পেরেছি? আজ স্বাধীন বাংলাদেশে দুর্নীতির মহোৎসব চলে। সাধারণ মানুষের হক কেড়ে নিয়ে একদল মানুষ নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। টেন্ডারবাজি আর চাঁদাবাজি আজ এক ভয়ংকর ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে পেশিশক্তির দাপট। সাধারণের জমি দখল করে গড়ে ওঠে প্রভাবশালীদের প্রাসাদ। এই দৃশ্যগুলো কি একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা কল্পনা করেছিলেন?

শৃঙ্খল ভেঙে আমরা যে দেশ চেয়েছিলাম, সেখানে সন্ত্রাসীর হুংকার থাকার কথা ছিল না। সেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমানোর নিশ্চয়তা চেয়েছিল। অথচ আজ তুচ্ছ কারণে হানাহানি আর রক্তপাতে রাজপথ রঞ্জিত হয়। ক্ষমতার লোভে নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। টেন্ডার নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারি অর্থ লুটপাট করা, বিদেশে টাকা পাচার করা যেন এক সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিরীহ কৃষকের ভিটেমাটি যখন দখলদারের গ্রাসে যায়, তখন স্বাধীনতার গৌরব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। এই অনাচারগুলো আমাদের সেই অর্জিত স্বাধীনতার সংজ্ঞাকেই আজ প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আমাদের প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা অনেকটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে। আমরা ধরেই নিয়েছি, এটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে রক্ষা করা অনেক বেশি কঠিন। আজকের এই অস্থির সময়ে, বিভেদের এই রাজনীতিতে আমাদের সেই আদি চেতনায় ফিরে যাওয়া খুব জরুরি। সেই চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িকতার। সেই চেতনা ছিল সাম্যের। সেই চেতনা ছিল শোষিত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর।

বিটিভির সেই গানের কথায় বলা হয়েছিল– 'ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।' প্রশ্ন হলো, তারা কি সত্যিই আমাদের হৃদয়ে ফিরে আসে? নাকি আমরা কেবল আনুষ্ঠানিকতায় তাদের সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি? ২৬শে মার্চ এলে আমরা ফুল দেই, গান গাই। কিন্তু বছরের বাকি দিনগুলোতে আমাদের সেই বোধের জানালাগুলো কেন বন্ধ থাকে? কেন আমরা দুর্নীতির কাছে মাথা নত করি? কেন আমরা অন্যের মতকে সম্মান জানাতে দ্বিধাবোধ করি?

আমাদের মুক্তি অর্জিত হয়েছে অনেক আগে। কিন্তু আমাদের মানসিক মুক্তি কি আজও পুরোপুরি এসেছে? ১৯৭১ ছিল একটি মাইলফলক। কিন্তু ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে আমাদের দায়বদ্ধতা আরও বেড়েছে। কেবল অবকাঠামোয় উন্নয়ন নয়, প্রয়োজন নৈতিকতার উন্নয়ন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আর সন্ত্রাসহীন পরিবেশই হতে পারে শহিদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান। একটি সমৃদ্ধ, সুন্দর আর মানবিক বাংলাদেশ গড়াই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

শৈশবের সেই আটটার সংবাদের আগের সুরটি আজও আমার কানে বাজে। গানটি শেষ হওয়ার পর এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসত ঘরে। সেই নীরবতা ছিল ভাবনার। সেই নীরবতা ছিল কৃতজ্ঞতার। আজ সেই একই নীরবতা নিয়ে যদি আমরা নিজেদের ভেতরের জানালার কপাটগুলো খুলে দিই, তবেই হয়ত আমরা একাত্তরের সেই বীরদের আত্মত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারব।

আসুন, আমরা কেবল ইতিহাসের পাঠক না হয়ে ইতিহাসের ধারক হই। আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্যে যেন ফুটে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের সেই মূলসুর। রক্ত দিয়ে কেনা এই মাটিকে আমরা যেন আর কোনো কলঙ্কে বিদ্ধ না করি। স্বাধীনতা কেবল একটি দিন নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের, প্রতিটি মুহূর্তের এক গভীর অনুভব। এই দায় আমাদের সবার। এই দায় আগামী প্রজন্মের।

আসাদুজ্জামান খান মুকুল: লেখক ও কবি

জাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

জাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। এটি ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাকাত আরবি শব্দ। যার প্রধান দুটি অর্থ—পবিত্রকরণ এবং বৃদ্ধিকরণ। জাকাত আদায় করা হলে মানুষের ধন-সম্পদ থেকে গরিবের হক আদায় হয়। ফলে তা হালাল ও পবিত্র হয়। আবার জাকাতের মাধ্যমে শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়, সমাজে দারিদ্র্যের হার কমতে থাকে এবং সচ্ছল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সে অর্থেই জাকাত অর্থ বৃদ্ধি করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, নিজের ও পরিবারের সারাবছরের যাবতীয় প্রয়োজন ও ঋণ নির্বাহের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রোপ্য অথবা সমপরিমাণ জাকাতযোগ্য সম্পদ কারো নিকট যদি পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত সঞ্চিত থাকে, তবে তার

চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে আল্লাহর নির্দেশিত পথে গরিব-মিসকিনদের মাঝে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার বিধানকেই জাকাত বলা হয়। ইসলামি বিধান মতে, ধনী ব্যক্তিদের জাকাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। ইসলামে নামাজকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জাকাতকে। *পবিত্র কোরানের* ৮২ জায়গায় নামাজের এবং ৩২ জায়গায় জাকাতের কথা বলা হয়েছে। আর ২৭ জায়গায় নামাজ ও জাকাতের কথা একত্রে বলা হয়েছে। সামর্থ্যবান ব্যক্তি জাকাত আদায় না করলে তার পরিণাম বা ফলাফল সম্পর্কেও *পবিত্র কোরানে* হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

জাকাতের উদ্দেশ্য হলো, সহায়তার মনোভাব পোষণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমিয়ে আনা। আমরা জাকাতের অন্যান্য সকল দিক আলোচনায় না এনে কেবল উল্লিখিত তিন/চারটি দিক সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, জাকাত সামাজের জন্য খুবই কল্যাণকর একটি ব্যবস্থা। কল্যাণময় সমাজের জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য দিক। যে সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি সে সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিও তত বেশি। আমরা সকলে এও স্বীকার করব যে, উচ্চ শিক্ষিত হতে হলে অর্থ প্রয়োজন। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা তাদের সন্তানদের শুধু অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় যদি ধনী মানুষগুলো ইসলামি আইন অনুযায়ী তাদের অর্থের শরিয়ত নির্ধারিত অংশ জাকাত হিসেবে সমাজের এই গরীব মানুষগুলোর হাতে যথাযথভাবে আদায় করে তবে সে মানুষগুলো তাদের সন্তানগুলোকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারে।

ভবিষ্যতে এ শিক্ষিত মানুষগুলো সমাজের জন্য হয় আশীর্বাদ ও কল্যাণকর। কখনোই তারা সামজের জন্য বোঝা হয় না। তারা দেশ ও সমাজের উন্নয়নের জন্য এমন কিছু অবদান রাখতে পারে যা অশিক্ষিত থাকলে কোনোভাবেই তাদের দ্বারা সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত হবার ফলে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জন্ম নেওয়ায় সে সমাজের অনেক অনাচার, অবিচার ও অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার ফলে সমাজে শান্তির বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এভাবে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণময় হয়ে ওঠে।

মাহে রমজানের সাথে জাকাতের রয়েছে ঐতিহ্যগত সম্পর্ক। যেহেতু জাকাত চন্দ্রবর্ষ দ্বারা হিসাব করা হয়, সেহেতু আমাদের দেশে অধিকতর কল্যাণের আশায় সাধারণত রমজান মাসেই জাকাত আদায় করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ সাধনে জাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন অতীব প্রয়োজন। ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কারা জাকাত আদায় করবেন, কোন কোন জিনিসের জাকাত আদায় করবেন, জাকাতের সঠিক হিসাব কীভাবে করবেন, কোন কোন খাতে কীভাবে জাকাত আদায় করবেন এবং জাকাতের হকদারগণ কীভাবে জাকাত গ্রহণ করবেন এ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন

জাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে

হিসাব করে সম্পদের জাকাত প্রদান করুন

করা জাকাত দাতা ও জাকাত গ্রহীতা তথা সকল মুসলিম নরনারীর জন্যই ফরজ বা একান্ত অপরিহার্য। সাথে সাথে জাকাত আদায় না করা বা লোক দেখানো আদায় করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও সবাইকে অবহিত, সচেতন ও সতর্ক করাও ইমাম, মুয়াল্লিম, মুবাল্লিগ ও উলামায়ে দ্বীনগণের পবিত্র জিম্মাদারি দায়িত্ব।

জাকাত ব্যবস্থাই হলো বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সমাজের অসহায়, দরিদ্র, নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া জনগণকে অভাব ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য ইসলামে জাকাতের বিধান করা হয়েছে। তাই জাকাত হলো গরিবের সামাজিক নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি ও তাদের অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ। সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথই হচ্ছে জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এ পৃথিবীর সকল কিছুর মালিক মহান আল্লাহ। মানুষ তার প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর সকল ধন-সম্পদ ভোগ করে মাত্র। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– 'তুমি কি জানো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য কেবল আল্লাহরই, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারী নেই।' (সূরা বাকারা, ১০৭) এই ভূমণ্ডল সৃষ্টির পরে তিনি মানুষকে ধনী-দরিদ্র, উঁচুনীচু, সাদা-কালো ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এটিও তার সৃষ্টি রহস্যের একটি। এর মাধ্যমে তিনি তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন। কাউকে তিনি ধন-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে দারিদ্র্য দিয়ে। ধনীদের পরীক্ষা করার জন্য জাকাত আল্লাহর একটি উপলক্ষ্য মাত্র। এর মাধ্যমে সম্পদশালী ব্যক্তির আত্মার যেমন পরিশুদ্ধি আসে, তেমনি তার ধন-সম্পদ পবিত্র ও হালাল হয়। আর সমাজের অসহায়, ফকির, মিসকিন, দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায়।

জাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। ইসলামে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় ধনীরা তাদের সম্পদের কিছু অংশ জাকাত দিলে গরিবদের সম্পদ কিছুটা বেড়ে যায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হয়। জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মহানবি (সা.)-এর আদর্শ মদিনা রাষ্ট্র, খেলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিমোচন করে মুসলিম উম্মাহকে সমকালীন বিশ্বে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিল। এভাবে জাকাত ফান্ডের অর্থ দিয়ে যদি অভাবীদের একটি তালিকা তৈরি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশটি পরিবারকে বাছাই করে প্রত্যেক পরিবারকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে উপার্জনযোগ্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় এবং যে পরিবারের কর্তা একজন শক্তিমান পুরুষ তাকে একটি ভ্যান বা মাঝারি নৌকা কিনে দেওয়া হয়, যে পরিবারের কর্তা একজন বয়োবৃদ্ধ পুরুষ তাকে একটি ছোটো পান-চায়ের দোকান করে দেওয়া হয়, আর যে পরিবারের প্রধান একজন বিধবা নারী তাকে একটা ভালো সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া হয় তাহলে এর সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার করে তারা দৈনন্দিন রোজগার করে সংসার চালাতে পারবে। এভাবে প্রতিবছর যদি বিশটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করা যায় তাহলে মদিনায় যেমন খেলাফায়ে রাশেদিনের শেষ দিকে জাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি,

তেমনি ২০ বছর পর হয়ত ঐ মহল্লায়ও জাকাত নেওয়ার মতো কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এজন্য প্রয়োজন হবে সম্মিলিত সামাজিক অঙ্গীকার। আমরা বলতে পারি যে, আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাকাত এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাকাত ব্যবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য নিরসনে এটি এক উত্তম ব্যবস্থা। সাম্য ও সমতার বিধান ছাড়া সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষা হয় না। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ হলেই সমাজ স্থিতিশীল হয়। অপরাধ কমে আসে। তাই এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জাকাত সমাজে অর্থনৈতি উন্নয়ন ও বৈষম্য নিরসনে এক অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইদানীং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংকগুলো সমাজে বিদ্যমান অসহনীয় দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনকল্পে জাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করে তহবিল গঠন এবং সেই তহবিল থেকেই দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো নিজেদের তহবিলের জাকাত ছাড়াও তাদের গ্রাহকদের দেওয়া জাকাত নিয়ে গড়ে তুলেছে জাকাত ফাউন্ডেশন। মূলত নগদ সাহায্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন –এই তিনটি বৃহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। অনুরূপভাবে কোনো এলাকার বিত্তবান লোকজন যদি জাকাতের তহবিল গঠন করে গরিব মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়, তাহলেও গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হবে। নতুবা জাকাত সরকারি জাকাত ফান্ডে জমা দিতে হবে এবং সেখান থেকে জনকল্যাণের প্রয়োজনীয় কার্যকর ভূমিকা নিলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। সরকারের বাস্তবমুখী উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং কার্যকর ভূমিকা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার পাশাপাশি এ দেশে যারা সাহেবে নিসাব, তারা সবাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিয়মিত জাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের জন্য উদ্যোগী হলে দেশে গরিব জনগণের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে। সরকারের রাজস্ব ফান্ডও হবে সমৃদ্ধ আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি হবে আরও বিস্তৃত। এ জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার। তাই রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় বাড়ানো আর জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সব স্তরে জাকাত বিষয়ক ইসলামি অর্থনীতির শিক্ষা চালু করা, সর্বস্তরের মানুষের কাছে জাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা, সব মুসলিম দেশে সরকারিভাবে জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জাকাত আক্ষরিক অর্থেই সম্পদকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে সম্পদের পরিধি বৃদ্ধি করে। জাকাত দাতার মন থেকে লোভ-লালসা, অহংকার ও কৃপণতা দূর করে তাকে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। এটি ধনীদের সাথে দরিদ্রদের সুসম্পর্ক স্থাপন করে এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও সামাজিক সংহতি রক্ষা করে। জাকাতের মাধ্যমে অভাবী, ঋণগ্রস্ত এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করে তাদের স্বাবলম্বী করা হয়। এটি একটি অবশ্য পালনীয় আর্থিক ইবাদত, যা ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর অন্যতম । সংক্ষেপে, জাকাত কেবল দরিদ্রকে অর্থ দেওয়া নয়, বরং এটি সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এক মহান মাধ্যম। এজন্য প্রয়োজন হবে সম্মিলিত সামাজিক অঙ্গীকার।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাকাত এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাকাত ব্যবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়। মোটকথা ইসলামি সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জাকাত একদিকে যেমন অসহায়তা অবসানের গ্যারান্টি রাখে তেমনি অর্থনৈতিক চাকাকে গতিশীলও রাখে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও সুদৃঢ় ও সমুন্নত করে। এ সব কারণে জাকাতের আর্থসামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ: সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি এবং রোটারি লার্নিং ফেসিলিটেটর, রোটারি ক্লাব, ঢাকা এলিট

রাজধানীতে নারীদের জন্য বাস সার্ভিস চালুর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজধানীতে নারীদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস চালুর নির্দেশ দেন। ২রা মার্চ সচিবালয়ে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল ইসলামকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন। এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী। এসময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সড়ক পরিবহণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রবিউল ইসলামের কাছ থেকে তথ্য নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দিয়েছেন। আতিকুর রহমান রুমন আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে নারী বাস সার্ভিস চালুর জন্য মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

২৫শে মার্চ 'গণহত্যা দিবস' ও কালরাত্রি

রহিমা আক্তার মৌ

মূলত ইংরেজদের শাসন-শোষণের অবসানের পর তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানি শাসকচক্র এদেশের মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন চালাতে থাকে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের ঝড় তোলে পর্যায়ক্রমে ১৯৬৬ সালের ৬ (ছয়) দফা আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধিকারের আন্দোলনে। স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকচক্র এদেশের মানুষকে বার বার চেষ্টা করেও দমন করতে পারেনি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। সে নির্বাচনে বাঙালিরা জাতীয় সংসদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। গণমানুষের রায় উপেক্ষা করে পাকিস্তান সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে এদেশে চালায় সামরিক নির্যাতন।

৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গের প্রবাহমান রাজনৈতিক স্রোত বাস্তবে এসে অনুধাবন করেছিল। তাই ২৫শে মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমানোর পূর্বে এদেশের মানুষকে নির্বিচারে হত্যার জন্যে সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিয়ে যায়। সে নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তানি হায়েনারা এদেশের ঘুমন্ত মানুষের ওপর নির্বিচারে হামলা চালাল ও নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দেশটা আমাদের ছোটো কিন্তু অর্জনগুলো বিশাল। সেই বিশাল অর্জনগুলো হলো ১৯৪৭, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ২৬শে মার্চ ১৯৭১, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্ব থেকেই আমাদের লড়াইতে নামতে হয়। দেশভাগ হয় ঠিকই কিন্তু দেশের ভেতরেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রাণ হারাতে হয়। উর্দুর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায় বাঙালির বাংলা ভাষা। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো বাংলা ভাষা তবুও আমরা পরাধীন। পরাধীনতার আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে মুসলিম আধিক্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিত করা হয় যার ফলে পাকিস্তানের মানচিত্রে দুটি পৃথক অঞ্চল অনিবার্য হয়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত যার একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান।

অর্জনের দিনের সাথে যুক্ত হলো একটি কালরাত্রি, তারিখ ২৫শে মার্চ ১৯৭১। একাত্তরের ২৫শে মার্চের গণহত্যা শুধু একটি রাতের হত্যাকাণ্ডই ছিল না, এটা ছিল মূলত বিশ্ব সভ্যতার জন্য এক কলঙ্কজনক জঘন্যতম গণহত্যার সূচনা মাত্র। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বীর বাঙালির জীবনে নেমে আসে এক কালো অধ্যায়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানি জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় সৃষ্ট হয় রাজনৈতিক অচলাবস্থা। এটি নিরসনের প্রক্রিয়া চলাকালে পাকিস্তানি সেনারা ২৫শে মার্চ কুখ্যাত 'অপারেশন সার্চলাইট' নাম দিয়ে নিরীহ বাঙালি বেসামরিক লোকজনের ওপর গণহত্যা শুরু করে। তাদের এ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সকল সচেতন নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করা।

"এই অভিযানের (অপারেশন সার্চলাইট) নির্দেশনামা তৈরি করে পাকিস্তানের ২ সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।

নির্দেশনামার কোনো লিখিত নথি রাখা হয়নি। গণহত্যার সেই পুরো নির্দেশ মুখে মুখে ফরমেশন কমান্ডার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হয়। অনেক পরে, ২০১২ সালে, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা *এ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি* নামে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত সে আত্মজীবনীতে প্রথমবারের মতো অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়।

অপারেশন সার্চলাইট কীভাবে পরিকল্পিত হয়, ১৯৭১ সালের সেই স্মৃতিচারণ করে রাজা লিখেছেন, '১৭ মার্চ, সকাল প্রায় ১০টা বাজে। টিক্কা খান আমাকে ও মেজর জেনারেল ফরমানকে কমান্ড হাউসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে খবর পাঠান। খবর পেয়ে আমরা দুজন টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করি। গিয়ে দেখি, সেখানে জেনারেল আবদুল হামিদ খানও রয়েছেন। টিক্কা খান আমাদের বলেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের সমঝোতা আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট চান আমরা যেন সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং সে অনুযায়ী একটা পরিকল্পনা তৈরি করি। এছাড়া আর কোনো মৌখিক বা লিখিত নির্দেশনা আমরা পাইনি। আমাদের বলা হয়, পরদিন ১৮ মার্চ বিকেলে আমরা দুজন যেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ওই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করি।'

পরদিন সকালেই খাদিম হোসেন রাজা তার কার্যালয়ে রাও ফরমান আলীকে নিয়ে বসেন। তারাই গণহত্যার এ অভিযানের নাম দেন অপারেশন সার্চলাইট।" (তথ্যসূত্র: *ডেইলি স্টার বাংলা*, ২৫শে মার্চ ২০২৩)

২৫শে মার্চের গণহত্যা শুরু হলে মধ্য রাতের পর স্বাধীনতা ঘোষণা হয়। নয় মাসের যুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মদান, আড়াই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং জাতির অসাধারণ ত্যাগের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। এর পরিক্রমায় বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ২৫শে মার্চ ১৯৭১, মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পূর্বপরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা অনুযায়ী আন্দোলনরত বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ও নিকৃষ্টতম গণহত্যা।

২৫শে মার্চের আগেই অনেক কৌশল হাতে নেয় পশ্চিম পাকিস্তান। বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি ইউনিটগুলোকে ভাগ করে ফেলে। কাজ দেখিয়ে তাদেরকে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন দেখায়। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অনেক সৈনিককে ছুটিতে পাঠিয়ে দেয়। কারো সাথে যেন কারো যোগাযোগ না হয় সেজন্যে রেডিও এবং তারহীন যোগাযোগের গ্রিড থেকে যত সম্ভব দূরে রাখা হয়। ঢাকার ইপিআর সদর দপ্তর, পিলখানার বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করে এবং ওয়্যারলেস ব্যবস্থা দখল করে নেয় ২২তম বেলুচ রেজিমেন্ট। অন্যদিকে ১৮নং পাঞ্জাব, ৩২নং পাঞ্জাব ও ২২নং বেলুচ রেজিমেন্ট ট্যাংক ও মর্টার হামলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। হানাদার বাহিনীর মেশিনগানের গুলি, ট্যাংক-মর্টারের গোলা আর আগুনের লেলিহান শিখায় নগরীর রাত হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ঘটে নৃশংসতম হত্যার সব থেকে বড়ো ঘটনাটি। হত্যাযজ্ঞ চলে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত।

সেদিন (২৫শে মার্চ ১৯৭১) সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ইয়াহিয়া খানের গাড়ির কনভয় স্টাফ হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার নামতেই সেই বহর আবার ফেরত গিয়েছিল প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে। কিন্তু সেই বহরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ছিলেন না। গাড়িতে তার জায়গায় বসেছিলেন ব্রিগেডিয়ার রফিক। পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিল যে সবাইকে বুঝি ধোঁকা দেওয়া গেছে। কিন্তু সেই সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তার বই *উইটনেস টু সারেন্ডার* এ লিখেছেন: 'মুজিবের গোয়েন্দারা গোটা খেলাটা বুঝে গিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানের নিরাপত্তা টিমে কর্মরত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ আর চৌধুরী দেখে ফেলেছিলেন যে একটা ডজ গাড়িতে ইয়াহিয়া খানের মালপত্র বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। তিনি সেটা শেখ মুজিবের কাছে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যে সাতটার সময়ে ইয়াহিয়া খান যখন বিমানে চড়ার জন্য এয়ারফোর্স গেট দিয়ে ঢুকছেন, তখন নিজের দপ্তরে বসে গোটা দৃশ্যটা দেখছিলেন উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার। ফোন করে শেখ মুজিবকে খবরটা জানিয়ে দেন তিনি।' (তথ্যসূত্র: *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ৩১শে মার্চ ২০১৭, *বিবিসির* হিন্দি বিভাগের রেহান ফজলের এই প্রতিবেদনটি অনুবাদ করেছেন অমিতাভ ভট্টশালী।)

১১ই মার্চ ২০১৭ জাতীয় সংসদে ২৫শে মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ায় প্রতি বছর বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়।

তেইশ বছরের শোষণ থেকে বাঙালির মুক্তির আন্দোলনের শ্বাসরোধ করতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে এ দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

২৫শে মার্চের সেই দিন শেষে নেমেছে সন্ধ্যা। গভীর হতে শুরু করেছে রাত। তখনো কেউ জানে না কী ভয়ংকর, নৃশংস ও বিভীষিকাময় রাত আসছে বাঙালির জীবনে। ব্যস্ত শহর ঢাকা প্রস্তুতি নিচ্ছে ঘুমের। ঘরে ঘরে অনেকে তখন ঘুমিয়েও পড়েছে। রাত সাড়ে ১১টায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে জিপ, ট্রাক বোঝাই করে নরঘাতক কাপুরুষ পাকিস্তানের সৈন্যরা ট্যাঙ্কসহ আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল শহরজুড়ে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে

গর্জে উঠল আধুনিক রাইফেল, মেশিনগান ও মর্টার। মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের মাধ্যমে পাক জল্লাদ বাহিনী নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো বর্বরোচিত নিধনযজ্ঞ আর ধ্বংসের উন্মত্ত তাণ্ডব। হকচকিত বাঙালি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। মানুষের কান্না ও আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে ওঠে শহরের আকাশ। মধ্যরাতে ঢাকা পরিণত হলো লাশের শহরে। রাজপথ, বসতবাড়ি ভেসে গেল বাংলার সোনার সন্তানের রক্তে। ঢাকা শহরের রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, নীলক্ষেতসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে তারা বাঙালি নিধন শুরু করে। ঢাকাসহ দেশের অনেক স্থানে মাত্র এক রাতেই হানাদাররা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল অর্ধ লক্ষাধিক বাঙালিকে। আর মানব ইতিহাসের পাতায় রচিত হলো কালিমালিপ্ত আরেকটি অধ্যায়। নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষকে বর্বরোচিতভাবে হত্যার ঘটনায় স্তম্ভিত হলো বিশ্ববিবেক।

শুধু নিষ্ঠুর ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকা গণমাধ্যমও সেদিন রেহাই পায়নি জল্লাদ ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা থেকে। পাক হানাদাররা সেই রাতে অগ্নিসংযোগ, মর্টার শেল ছুড়ে একে একে *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংবাদ*, জাতীয় প্রেসক্লাব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ হামলায় জীবন দিতে হয় বেশ কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মীকেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকরাও জান্তাদের কালো থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের নয় শিক্ষককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে চলে নৃশংসতম হত্যার সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটি। এখানে হত্যাযজ্ঞ চলে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত।

'আন্তর্জাতিকভাবে ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। ইতোমধ্যে এই অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জেনোসাইড ওয়াচ এবং লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন। এছাড়া সংস্থা দুটি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এই নৃশংস গণহত্যাকে আরও স্বীকৃতি দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলারস (আইএজিএস)। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩ তারিখের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।' (তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া)

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত আবাসনের ২৪নং বাড়িতে। ওই বাড়ির নীচে দুপায়ে গুলিবিদ্ধ দুই মা তাদের শিশু সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সিঁড়ি ভেসে যাচ্ছিল তাদের রক্তে। পাক হায়নারা ভেবেছিল অন্য কোনো দল হয়ত অপারেশন শেষ করে গেছে। তাই তারা আর ওই বাড়িতে ঢোকেনি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তখন প্রাণে বেঁচে যান।

মুক্তিযুদ্ধের গবেষক এবং ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রধান ডা. এম এ হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'আমরা এ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঁচ হাজার বধ্যভূমির সন্ধান পেয়েছি, এর মধ্যে এক হাজার বধ্যভূমি চিহ্নিত। আমরা গণহত্যা প্রমাণের জন্য ফরেনসিক এভিডেন্সও জোগাড় করেছি। আর আমরা বধ্যভূমি থেকে মাথার খুলি, শরীরের হাড়গোড়ও পেয়েছি। এখানে ১৯৭১ সালে যা হয়েছে তা তো গণহত্যা অবশ্যই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। গণহত্যা হলো একটি জাতি, একটি গোষ্ঠী বা একটি সম্প্রদায়কে নির্মূলকরণ প্রক্রিয়া। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে হিন্দু শিক্ষক এবং ছাত্রদের হত্যা করা হয় ধর্মীয় কারণে। আর পুরো বাঙালি জাতিকে নির্মূলের কাজ করে পাকিস্তানি সেনবাহিনী'।

নির্বিচারে এই গণহত্যার স্বীকৃতি খোদ পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত দলিলেও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র পাকিস্তানি সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ করেছিল, তাতে বলা হয়, '১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত এক লাখেরও বেশী মানুষের জীবন নাশ হয়েছিল।'

অস্ট্রেলিয়ার *সিডনি মর্নিং হেরাল্ড* পত্রিকার ভাষ্যমতে শুধুমাত্র পঁচিশে মার্চ রাতেই বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, যা গণহত্যার ইতিহাসে এক জঘন্যতম ভয়াবহ ঘটনা। পরবর্তী নয় মাসে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পূর্ণতা দিয়েছিল সেই বর্বর ইতিহাসকে।

মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন ২৫শে মার্চ ভয়াল রাত সম্পর্কে লিখেছেন, 'সেই রাতে ৭০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়, গ্রেপ্তার করা হল আরো ৩০০০ লোক। ঢাকায় ঘটনার শুরু মাত্র হয়েছিল। এর পর সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে সৈন্যরা বাড়িয়ে চললো মৃতের সংখ্যা। জ্বালাতে শুরু করলো ঘরবাড়ি, দোকানপাট। লুট আর ধ্বংস যেন তাদের নেশায় পরিণত হলো। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো কাক-শেয়ালের খাবারে পরিণত হলো। সমস্ত বাংলাদেশ হয়ে উঠলো শকুন তাড়িত শ্মশান ভূমি'। (তথ্যসূত্র: *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৫শে মার্চ ২০২৪)

রহিমা আক্তার মৌ: প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

পিলখানায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন প্রথম বিদ্রোহ—মহান মুক্তিযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ

মো. শরিফুল ইসলাম

ঢাকার পিলখানা ২৩০ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম বাহিনীর সদর দপ্তর, এটি কেবল একটি প্রশাসনিক স্থাপনা নয়, দেশপ্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অঙ্গীকার পূরণের এক জীবন্ত প্রাঙ্গণ। এখানকার প্রাণবন্ত প্রকৃতি যেন ধারণ করে আছে জাতির সংকটকালের স্পন্দন। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজিতে ভরপুর পিলখানার অসংখ্য প্রাচীন বৃক্ষের মাঝে একটি বিশেষ বটবৃক্ষ—যার সাথে জড়িয়ে আছে ১৯৭১ সালের রক্তাক্ত মার্চের দুঃসাহসিক বীরত্বগাথা, যার ইতিহাস বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছিল।

সেই বিস্মৃত ইতিহাসের অনুসন্ধানে

২০২১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ‘স্পাইস’ নামের একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে ‘অপারেশন সার্চলাইট’-এর অংশ হিসেবে পিলখানায় সংঘটিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে ‘অতন্দ্রঃ বিজয়ের ৫০’ শীর্ষক একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করে। প্রামাণ্যচিত্রটি সম্প্রচারের মধ্য দিয়েই ‘স্পাইস’ টেলিভিশন তার যাত্রা শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে পিলখানার অভ্যন্তরে শ্যুটিংয়ের অনুমতি চেয়ে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ বাহিনীর মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় মহাপরিচালক মহোদয় জনসংযোগ কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ দেন। শ্যুটিংয়ের প্রস্তুতিকালে টেলিভশন কর্তৃপক্ষ জানায়, ২৫শে মার্চের ঘটনার সময় পিলখানায় উপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমানে জীবিত আছেন, এমন একজন তৎকালীন ইপিআর সদস্যের সাক্ষাৎকার তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি নিশ্চিত করতে জনসংযোগ কর্মকর্তা রেকর্ড উইংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তৎকালীন ইপিআরের সিপাহি (পরবর্তীতে ল্যান্স নায়েক) আব্দুল মালেক, বীরপ্রতীকের সন্ধান পায় এবং আব্দুল মালেকের মোবাইল নাম্বার স্পাইস টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করে। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ সিলেট থেকে বীরপ্রতীক আব্দুল মালেককে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং পিলখানার অভ্যন্তরে টানা তিন রাত ধরে শ্যুটিং সম্পন্ন করে। ল্যান্স নায়েক বীরপ্রতীক আব্দুল মালেকের সাক্ষাৎকারে উঠে আসে এক অসীম সাহসিকতার বীরত্বগাথা। ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ দিবাগত রাতে তৎকালীন ইপিআরের কতিপয় সাহসী ও অকুতোভয় বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্টের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পিলখানার বটবৃক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটায়। সাক্ষাৎকার শেষে ঘটনাটির বিস্তারিত জানতে চাইলে বীরপ্রতীক আব্দুল মালেক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত *যুদ্ধদিনের আত্মস্মৃতি* শীর্ষক একটি বই ধরিয়ে দেন, যা সেই সময়কার ঘটনাবলির এক মূল্যবান দলিল।

বীরপ্রতীক আব্দুল মালেকের সাক্ষাৎকার এবং তাঁর বইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে করা অনুসন্ধানে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে পিলখানায় বটবৃক্ষে পতাকা উত্তোলনের একটি সাদাকালো ছবি আবিষ্কার করা হয়। ছবির নীচে সংক্ষিপ্ত তথ্য—১৯৭১ সালের মার্চে পিলখানার এক গাছে উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। তথ্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাৎপর্যে বিপুল। পরাধীন দেশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের এই ঘটনা শুধু প্রতীকী সাহসিকতা নয়, এটি ছিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ— মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ এবং স্বাধীনতার প্রত্যয়ে এক সুদৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ।

বিষয়টি নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও সে সময়ের বিজিবি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে আর অগ্রসর হননি। পরবর্তীতে বিজিবি দিবস উপলক্ষ্যে ২৩০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস সংরক্ষণের অংশ হিসেবে ১৭৯৫ সালে ‘রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন’ থেকে শুরু করে কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে আজকের আধুনিক, ত্রিমাত্রিক ও সুশৃংখল ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’ হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আসালং বিদ্রোহ ও চাইনিজ আম্বানসহ বিভিন্ন বিদ্রোহে বাহিনীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ ‘ভাইসরয় কমেন্ডেশন’ ও ‘নিশান-ই-হায়দার’ -এর মতো গৌরবময় পদক অর্জন এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ইপিআরের অবিস্মরণীয় অবদান ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিডিআর ও বর্তমান বিজিবির অবদান খুঁজতে গিয়ে আবারো সামনে আসে ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ দিবাগত রাতে তৎকালীন ইপিআরের অকুতোভয় সাহসী সৈনিকদের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের বীরত্বগাথা। এই পতাকা উত্তোলনের ছবি থেকে মেজর রইসুল আজম মনির তত্ত্বাবধানে শিল্পী মনোজ পালের দক্ষ হাতের সুনিপুণ কারুকার্যে তামার তারে গড়ে ওঠে পতাকা উত্তোলিত সেই প্রতীকী বটবৃক্ষের অবয়ব।

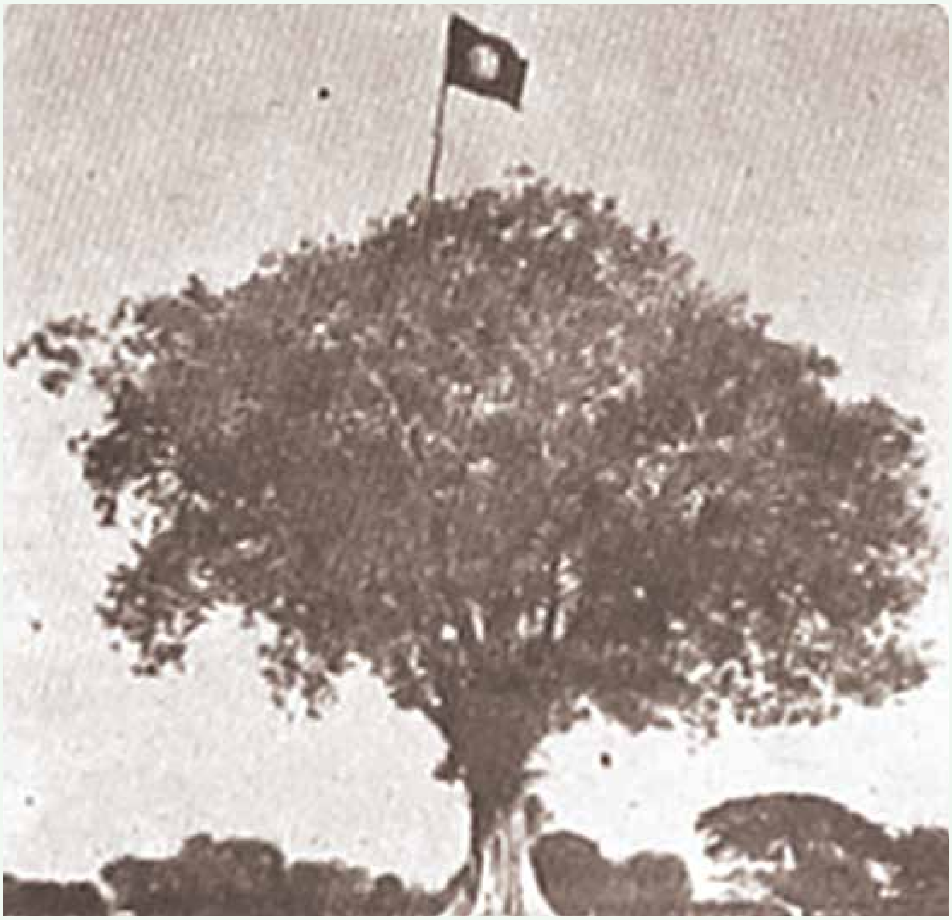

আব্দুল মালেক, বীরপ্রতীক। বিজিবির চেইন অব কমান্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সিলেটের আম্বরখানা থেকে তাঁকে পিলখানায় আনা হয়। সম্ভাব্য কয়েকটি প্রাচীন বটবৃক্ষ চিহ্নিত করে দেখানো হলে তিনি দৃঢ়ভাবে জানান– এসবের কোনোটিই সেই বটবৃক্ষ নয়। সময়ের প্রবাহে পরিবর্তিত পিলখানার ভৌগোলিক রূপ তাঁর স্মৃতিকে প্রথমে বিভ্রান্ত করেছিল। তিনি যেতে চান ১৯৭১ সালে যেখানে দায়িত্ব পালন করতেন, সেই সিগন্যাল সেন্টারের দিকে। কিন্তু পুরানো স্থাপনার আর অস্তিত্ব নেই। পরে যে ব্যারাকে তিনি অবস্থান করতেন, সেখানে পৌঁছে যেন অতীতের দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়। স্মৃতির ছেঁড়া সুতোগুলো জোড়া লাগতে শুরু করে। ২২শে মার্চ দিবাগত রাতের সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটি বটবৃক্ষের সামনে থমকে দাঁড়ান। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জানান– এই গাছেই উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীনতার সেই লাল-সবুজের পতাকা। গাছটিকে তিনি স্যালুট করেন। মুহূর্তটি ছিল ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংলাপের মতো, যেন বৃক্ষের নীরবতায় ধ্বনিত হচ্ছিল সাহস, শপথ ও আত্মত্যাগের প্রতিধ্বনি।

গাছটি শনাক্ত হলেও থেমে থাকেনি অনুসন্ধান। পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্য সদস্যদের পরিচয় নিশ্চিত করতে শুরু হয় নতুন উদ্যোগ। বীরপ্রতীক আব্দুল মালেকের মুখ থেকে বের হয়ে আসে তৎকালীন ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের সিনিয়র সদস্য নায়েব সুবেদার আব্দুল হাই সাহেবের নাম। শুরু হয় হাই সাহেবের খোঁজ। বিজিবির রেকর্ড উইং সম্ভাব্য নামগুলো যাচাই করে। প্রাপ্ত নম্বর ধরে যোগাযোগ করা হয় বিভিন্ন স্থানে। বরিশালের উজিরপুরে গিয়ে সন্ধান মিলে আব্দুল হাইয়ের। সন্ধান মিললেও আব্দুল হাই জানান, তিনিও সেদিন পতাকা উত্তোলনের সাথে ছিলেন বটে কিন্তু তিনি সেই প্রত্যাশিত আব্দুল হাই নন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। পরবর্তীতে রেকর্ড উইংয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকার মিরপুরের কাফরুলে মিলে নায়েব সুবেদার আব্দুল হাইয়ের পরিবারের সন্ধান। নায়েব সুবেদার আব্দুল হাইয়ের সহধর্মিণী সুফিয়া

বিজিবির বর্তমান মহাপরিচালককে তার বিজিবিতে যোগদানের অব্যবহিত পরেই তামার তারে নির্মিত একটি প্রতীকী বটবৃক্ষ দেখিয়ে এর পেছনে তৎকালীন ইপিআর সদস্যদের বীরত্বগাথা বর্ণনা করা হলে মহাপরিচালক মহোদয় ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, বটবৃক্ষের অবস্থান এবং পতাকা উত্তোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের নির্দেশ দেন। শুরু হয় বিস্তৃত ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধান। পুরানো পত্রিকা, আর্কাইভ ফুটেজ, গ্রন্থাগারের দুর্লভ বই, রেকর্ড রুম– সবখানে চলতে থাকে নিবিড় অনুসন্ধান। পিলখানায় পতাকা উত্তোলনের আরেকটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় বিজিবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস* শীর্ষক বইয়ের তথ্যের মাধ্যমে। তখন একটি ছবি হয়ে ওঠে ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের প্রগাঢ় অনুপ্রেরণা।

স্মৃতির পথে প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘদিনের গভীর অনুসন্ধান, বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাপক গবেষণায় জানা যায়, ১৯৭১ সালের মার্চে পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন ইপিআরের ১০/১১ জন অকুতোভয় বাঙালি সদস্য। বেঁচে আছেন শুধুই ল্যান্স নায়েক

বেগমের দেওয়া তথ্যে উঠে আসতে থাকে ইতিহাসের সেই কাঙ্ক্ষিত সত্যের অকাট্য প্রমাণ। যোগাযোগ করা হয় ঢাকার মোহাম্মদপুরে শহিদ নায়েব সুবেদার শামসুল হকের সহধর্মিণী (আমেরিকা প্রবাসী) ও তাঁর ছেলে শহীদুল হক, মোহাম্মদপুরে শহিদ হাবিলদার খোরশেদ আলমের ছেলে আজিজুল আলম, নোয়াখালীর শহিদ হাবিলদার খোরশেদ আলমের নাতি মামুন, ঢাকার মানিকদীতে পতাকা উত্তোলনকারী হাবিলদার মোশাররফ হোসেনের ছেলে শাহাদৎ হোসেন, নরসিংদীর শহিদ নায়েক সিগন্যাল মহি উদ্দিন ভূইয়ার সহধর্মিণী রওশনারা বেগম ও মেয়ে মাসুদা বেগম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পতাকা উত্তোলনকারী ল্যান্স নায়েক রেজাউল হক এবং গোপালগঞ্জের শহিদ সিপাহি সিগন্যাল আবুল বাশারের ভাই আবুল কালাম ও ঢাকার বাড্ডায় বোন পারুল আক্তারের সাথে। সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ছবি। পাশাপাশি সাংবাদিকের তত্ত্বাবধানে নেওয়া হয় পিলখানার আশপাশের স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য। সব মিলিয়ে তৈরি হয় প্রমাণভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে নিশ্চিত হয়– গাছটি বটবৃক্ষ নয়, পাকুড়গাছ। তবে নামের এই সংশোধন তার মাহাত্ম্যকে বিন্দুমাত্র ম্লান করেনি বরং ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রজ্ঞা ও দায়বদ্ধতাকে উজ্জ্বল করেছে। গাছটির অবস্থান ও বয়স ১৯৭১ সালের ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই অনুসন্ধান কেবল একটি গাছ চিহ্নিত করার প্রয়াস ছিল না; এটি ছিল ইতিহাসকে সত্যের আলোয় পুনর্গঠনের দায়িত্বশীল প্রয়াস।

২২শে মার্চ দিবাগত রাতে ইপিআর সদস্যদের সেই দুঃসাহসিক বীরত্বগাথা

১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও শোষণের প্রতিবাদে উত্তাল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ। মুক্তিকামী বাঙালি সিদ্ধান্ত নেয়—২৩শে মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' নয়, পালিত হবে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে। উড়বে না আর পাকিস্তানের পতাকা; বাংলার মাটিতে উড়ানো হবে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। মুহূর্তেই এ খবর পৌঁছে যায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছে। ১৫ই মার্চ সমগ্র পিলখানার নিয়ন্ত্রণ নেয় পাকিস্তান থেকে ছুটে আসা ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের সামরিক সদস্যরা। ১৬ই মার্চ নিরস্ত্র করা হয় পিলখানাস্থ ইপিআরের বাঙালি সদস্যদের। একদিকে বেলুচ রেজিমেন্টের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, আরেক দিকে চাপা উত্তেজনা, চারদিকে বন্দুক তাক করা, থমথমে পরিস্থিতি; যে-কোনো মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যেই ইপিআরের একদল সাহসী বাঙালি সৈনিক নিলেন এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত– উত্তোলন করবেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, গোপনে, সতর্কতায়, নীরব পরিকল্পনায় তাঁরা এগিয়ে গেলেন। আর সেই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পিলখানার সবচেয়ে উঁচু একটি গাছ। ২২শে মার্চ দিবাগত রাতে, নায়েব সুবেদার আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে ইপিআরের ১০/১১ জন দেশপ্রেমিক ও সাহসী সৈনিক সেই গাছে উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ২৩শে মার্চ সকালে তা উড়তে থাকে দৃপ্তভাবে—শত্রুর ঘাঁটির ভেতরেই স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে। এই ঘটনাই ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম সামরিক বিদ্রোহ, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ, যা মুহূর্তেই বারুদের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। ঢাকার পাশাপাশি যশোর, সাতক্ষীরা, রাজশাহী, দিনাজপুর ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একই সাহসিকতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। বেলুচ রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রিত পিলখানায় এই পতাকা উত্তোলন ছিল এক অসাধারণ দুঃসাহসিকতা, যা পাকিস্তানি শাসকদের জন্য ছিল সুস্পষ্ট বার্তা; বাঙালি জাতির স্বাধীনতার অটল সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ।

২৫শে মার্চের কালরাত ও মহান মুক্তিযুদ্ধ

২২শে মার্চ দিবাগত রাতের সেই সাহসিকতার পর আসে ২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় রাত। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পিলখানায় চালানো হয় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত ইপিআর সদস্যদের ওপর নেমে আসে নৃশংসতা। সুবেদার মেজর শওকত আলী, নায়েব সুবেদার আব্দুল হাই, নায়েব সুবেদার শামসুল হক ও হাবিলদার খোরশেদ আলমসহ অনেককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজে। তাঁদের ওপর চালানো হয় অমানবিক নির্যাতন। তবু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— নির্যাতন তাঁদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। শেষে তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের পাগলায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে; সেখানে ব্রাশফায়ার করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁদের। সেদিন রাতে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেন তৎকালীন ইপিআরের সিপাহি আব্দুল মালেকসহ পতাকা উত্তোলনকারী বেশ কয়েকজন সদস্য।

শুধু আব্দুল হাই, আব্দুল মালেকেরা নন, তৎকালীন ইপিআরের ১২ হাজার অকুতোভয় বাঙালি সৈনিক স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজনকে রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ইপিআরের ৮১৭ জন সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের কাছে পতাকা ছিল আত্মমর্যাদার প্রতীক; জীবন উৎসর্গের শপথ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ ও ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, ৮ জন বীরউত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম এবং ৭৭ জন বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

শহীদ নায়েব সুবেদার সিগন্যালম্যান আব্দুল হাই মিয়া

শহীদ নায়েব সুবেদার সিগন্যালম্যান শামসুল হক

শহীদ হাবিলদার খোরশেদ আলম

শহীদ সিপাহী আবুল বাশার সিকদার

হাবিলদার মোশাররফ হোসেন

শহীদ নায়েক মো: মহি উদ্দিন ভুঁইয়া

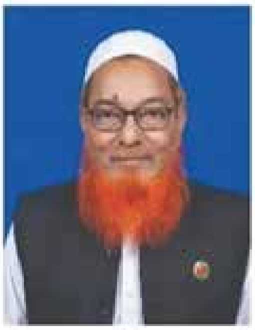

ল্যান্স নায়েক রেজাউল হক

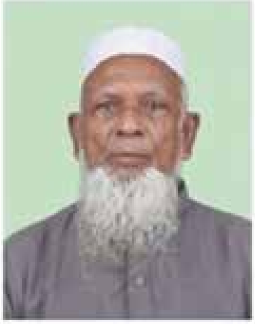

সিপাহী সিগন্যালম্যান আব্দুল হাই

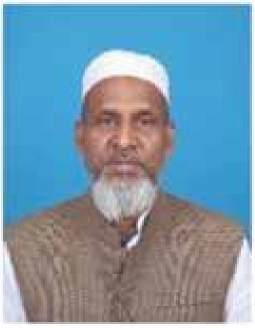

সিপাহী সিগন্যালম্যান আব্দুল মালেক, বীরপ্রতীক

২২শে মার্চ দিবাগত রাত, ১৯৭১: পিলখানায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন যাঁরা

নতুন প্রজন্মের অঙ্গীকার

এই অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চের পতাকা উত্তোলনের পূর্ণাঙ্গ ও প্রমাণভিত্তিক বিবরণ উঠে আসে। তথ্যচিত্র আকারে উপস্থাপিত হলে আবেগাপ্লুত হন বিজিবির সদস্যবৃন্দ। নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই গৌরবগাথা– যেন তারা জানে, সীমান্ত রক্ষার বর্তমান দায়িত্বের পেছনে রয়েছে আত্মত্যাগের গভীর ঐতিহ্য। আজও সেই বটবৃক্ষ (পাকুড়গাছ) নীরবে দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। তার ছায়া ইতিহাসের প্রতিধ্বনি। সে সাক্ষ্য দেয়– কিছু সাহসী মানুষ জীবন বাজি রেখে যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তা কেবল একটি প্রতীক নয়; এটি স্বাধীনতার অঙ্গীকার, আত্মমর্যাদার ঘোষণা এবং সীমান্ত রক্ষার অমোঘ প্রেরণা।

জাতীয় পতাকা আমাদের অনুপ্রেরণা, আমাদের শক্তি। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অতীতে যেমন দায়িত্ব পালন করেছে, আজও তেমনি সতর্ক ও অঙ্গীকারবদ্ধ। ভবিষ্যতেও থাকবে– জাতীয় পতাকা সমুন্নত রাখার দৃপ্ত প্রত্যয়ে, ইতিহাসের গৌরব বুকে ধারণ করে।

মো. শরিফুল ইসলাম: জনসংযোগ কর্মকর্তা, সদর দপ্তর, বিজিবি

স্বাধীনতার মাসে বুদ্ধিজীবীদের খোঁজে

মো. মোস্তাক আহমেদ

দিনটি ছিল ২রা মার্চ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে প্রথমবারের মতো উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা– সবুজ জমিনের উপর লাল বৃত্তের মাঝে সোনালি মানচিত্রখচিত সেই পতাকা। তবে আমি একাত্তরের সেই ঐতিহাসিক দিনটি নিয়ে আলোচনা করব না; বরং স্মৃতিচারণ করব ২০২৬ সালের একই দিনের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

চলছিল পবিত্র মাহে রমজান মাস। এর মধ্যেই ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে বাঙালির প্রাণের উৎসব অমর একুশে গ্রন্থমেলা। ব্যস্ততার কারণে সময় যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। তবুও ২রা মার্চ এক বিকেলে হঠাৎ গোধূলিলগ্নে ফাগুনের ঝরাপাতা মাড়িয়ে প্রবেশ করলাম বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে। চারপাশে বইপ্রেমী মানুষের ভিড়, নতুন বইয়ের ঘ্রাণ আর মেলার প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠেছিল পরিবেশ। একের পর এক স্টল ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি আটকে গেল একটি স্টলের ভেতরে টানানো ব্যানারে। স্টলের নাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ব্যানারটিতে ছিল এ দেশের কয়েকজন সূর্যসন্তানের নাম ও ছবি– যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন। জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ব্যানারটিতে যাঁদের নাম ছিল তারা হলেন– মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, আনোয়ার পাশা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন এবং কবি মেহেরুন্নেসা।

বাংলাদেশের এই মেধা-সন্তানদের দেখার পর আমার মনে অদ্ভুত এক অনুভূতির জন্ম হলো– কিছুটা ভাবুকতা, কিছুটা বিষণ্ণতা আবার কিছুটা ক্ষোভ। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পিতভাবে এ দেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছিল, যাতে নবজাত স্বাধীন বাংলাদেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়ে। আমরা কি তাঁদের ভুলতে বসেছি? না, আমরা ভুলিনি। এ নিবন্ধে তাঁদের জীবন, কর্ম এবং সংগ্রামের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

শহিদ মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নাট্যকার ও সাহিত্য সমালোচক। তিনি ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলায়। তাঁর পিতা খানবাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী ছিলেন একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর স্ত্রীর নাম লিলি চৌধুরী।

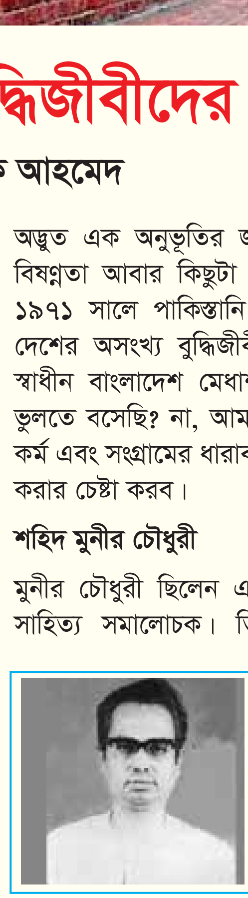

মুনীর চৌধুরী ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স (১৯৪৬) ও এমএ (১৯৪৭) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ (১৯৫৪) এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এমএ (১৯৫৮) লাভ করেন। পেশাগত জীবনে প্রথমে তিনি খুলনার ব্রজলাল কলেজে (১৯৪৭-১৯৫০) শিক্ষকতা শুরু

করেন। পরে জগন্নাথ কলেজে এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও বাংলা বিভাগে (১৯৫০-১৯৭১) দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন।

মুনীর চৌধুরী বামপন্থি রাজনীতি, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টি, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন এবং ওই বছরেরই শেষ দিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড এবং পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে সভা হয় তাতে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে নিরাপত্তা আইনে সরকার তাঁকে বন্দি করে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে ছিলেন এবং বন্দি অবস্থায়ই পরীক্ষা দিয়ে তিনি বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি আরও দুবার বন্দি হন। জেলে বন্দি অবস্থায়ই তিনি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচনা করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক *কবর* (১৯৫৩)।

মুনীর চৌধুরী বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯৭১ সালে ঢাকা অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব (১৯৬৬) ত্যাগ করেন।

নাট্যসাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো– রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), *কবর* (১৯৬৬), *চিঠি* (১৯৬৬), *দণ্ডকারণ্য* (১৯৬৬), *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য* (১৯৬৯) ইত্যাদি। এছাড়া বিদেশি নাটকের অনুবাদেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; যেমন- *কেউ কিছু বলতে পারে না* (১৯৬৯), *রূপার কৌটা* (১৯৬৯), *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০) ইত্যাদি নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে মুনীর চৌধুরী ছিলেন নবনাটকের উদ্‌গাতা।

এছাড়াও তিনি সাহিত্য সমালোচনায় *মীর-মানস* (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর *বাংলা গদ্যরীতি* (১৯৭০) নামক গ্রন্থে বাংলা গদ্যের, বিশেষত পূর্ব বাংলার সমকালীন বাংলা গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাংলা টাইপরাইটারের 'মুনীর অপটিমা' কী-বোর্ডও উদ্ভাবন করেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) ও দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), *স্বাধীনতা পুরস্কার* (১৯৮০), ভাষা সৈনিক ও রাজবন্দী পরিষদ সম্মাননা স্মারক (১৯৯৩) ও মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক সম্মাননা পরিষদ (১৯৯৬) লাভ করেন।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের দুদিন আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের সহযোগী আলবদর বাহিনী তাঁর বাবার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং সম্ভবত ওই দিনই তাঁকে হত্যা করা হয়।

শহিদ শহীদুল্লাহ কায়সার

শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন একজন কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখক। ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ছিলেন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। পান্না কায়সার তাঁর সহধর্মিণী। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও লেখক জহির রায়হান তাঁর অনুজ।

শহীদুল্লাহ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বিএ (১৯৪৬) পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি মূলত সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা করতেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ধারার সকল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক হিসেবে তিনি শ্রমিক-জনতার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সক্রিয় সংগ্রামের ওপর গুরুত্ব দিতেন। ১৯৫১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন-এ তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন এবং ৩রা জুন গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কারাভোগ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৮ সালের ১৪ই অক্টোবর সামরিক শাসক কর্তৃক তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় চার বছর কারাভোগের পর ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪৯ সালে ঢাকার সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* পত্রিকায় শহীদুল্লাহ কায়সারের সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি সংবাদ পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রধান উপন্যাস *সারেং বৌ* (১৯৬২)-এ মানুষ ও তার অস্তিত্বের সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কাম্য ছিল সুস্থ ও পরিশীলিত জীবনভিত্তিক একটি সমাজ। *সংশপ্তক* (১৯৬৫), *কৃষ্ণচূড়া মেঘ*, *তিমির বলয়*, *দিগন্তে ফুলের আগুন*, *সমুদ্র ও তৃষ্ণা*, *চন্দ্রভানের কন্যা*, *কবে পোহাবে বিভাবরী* (অসমাপ্ত) তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। *রাজবন্দীর রোজনামচা* (১৯৬২) ও *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ* (১৯৬৬) তাঁর স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাঁর *সারেং বৌ*-এর কাহিনি অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র এবং *সংশপ্তক* অবলম্বনে একটি জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে। শহীদুল্লাহ সাহিত্যকর্মের

জন্য আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২) *বাংলা একাডেমী পুরস্কার* (১৯৬৯), *মরণোত্তর একুশে পদক* (১৯৮৩) এবং *মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার* (১৯৯৮) লাভ করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে ১৪ই ডিসেম্বর রাতে ঢাকার বাসভবন থেকে তিনি অপহৃত হন এবং আর ফিরে আসেননি। শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন একজন আপোশহীন লেখক ও বুদ্ধিজীবী; যিনি সাহিত্য ও রাজনীতির মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

শহিদ জহির রায়হান

জহির রায়হান ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, গল্পকার, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র– উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা, সামাজিক বাস্তবতা ও জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে আধুনিক ধারার সূচনা করেন।

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯শে আগস্ট নোয়াখালী জেলার (বর্তমান ফেনী জেলার) মজিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। তাঁর পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ছিলেন একজন শিক্ষক ও আলেম। শৈশব ও কৈশোরে তিনি বিভিন্ন স্থানে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুমিতা দেবীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৯৬৮ সালে অপর চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুচন্দাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

অল্প বয়সেই জহির রায়হান কম্যুনিস্ট রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি যে ১০ জন প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়।

জহির রায়হান প্রথমে ছোটোগল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে তিনি উপন্যাস রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজের বৈষম্য, মানুষের সংগ্রাম, প্রেম এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে– *হাজার বছর ধরে*, *আরেক ফাল্গুন*, *বরফ গলা নদী*, *শেষ বিকেলের মেয়ে* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এবং এতে বাঙালির জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে 'হাজার বছর ধরে' গ্রামীণ বাঙালি জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস ও সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে মানবিকতা, প্রতিবাদী মনোভাব এবং বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

জহির রায়হান বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতেও একজন পথিকৃৎ। তিনি প্রথমে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ও চিত্রনাট্য রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৬১ সালে তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র কখনও আসেনি মুক্তি পায়। তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে– *কাঁচের দেয়াল*, *বেহুলা*, *জীবন থেকে নেয়া*, *আনোয়ারা*, *সঙ্গম* এবং *বাহানা* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে *জীবন থেকে নেওয়া* চলচ্চিত্রটি তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রতীকী চলচ্চিত্র হিসেবে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

তিনি *লেট দেয়ার বি লাইট* নামে একটি ইংরেজি ছবি নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি তা শেষ করতে পারেননি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জহির রায়হান সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেন। তিনি চলচ্চিত্র ও লেখার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পর তিনি কলকাতায় যান। এই সময় সেখান থেকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যার চিত্র সংবলিত বিখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র 'Stop Genocide' নির্মাণ করেন, যা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্বাধীনতার পর জহির রায়হান ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ঢাকা ফিরে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে অপহৃত হওয়া তাঁর ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারসহ আরও অনেককে বিহারিরা মিরপুরে আটকে রেখেছে বলে দৈবাৎ খবর পেয়ে ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি মিরপুর এলাকায় যান। কিন্তু সেখানে তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান এবং আর কখনও ফিরে আসেননি। ধারণা করা হয়, সেসময় লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের হাতে তিনি শহিদ হন।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য জহির রায়হানকে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), মরণোত্তর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭১/১৯৭২), মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৭৭) এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২) প্রদান করা হয়।

জহির রায়হান ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র– সব ক্ষেত্রেই সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর রচনায় বাঙালির জীবনসংগ্রাম, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধ গভীরভাবে প্রতিফলিত

হয়েছে। তাই তিনি বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরস্মরণীয়।

শহিদ আনোয়ার পাশা

আনোয়ার পাশা ছিলেন একজন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। সাহিত্যচর্চা ও প্রগতিশীল চিন্তার মাধ্যমে তিনি সমাজ ও দেশের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ডাবকাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী মকরম আলী ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আনোয়ার পাশা ভাবতা আজিজিয়া উচ্চ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করে ১৯৪৬ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাস করেন। পরে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ (১৯৪৮), রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ (১৯৫১) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ (১৯৫৩) পাস করেন। মানিকচক হাই মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। পরে বিভিন্ন স্কুল এবং পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে (১৯৫৮-১৯৬৫) শিক্ষকতা করার পর ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এখানেই কর্মরত ছিলেন।

আনোয়ার পাশার সাহিত্যজীবনের সূচনা ছাত্রাবস্থায়। রাজশাহী কলেজে বিএ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি রচনা করেন ‘হাসনাহেনা’ শিরোনামে একটি রম্যরচনা। তাঁর দুদশকের সাহিত্যজীবনে প্রকাশিত হয় মোট দশটি গ্রন্থ ও পনেরোটি প্রবন্ধ। তার মধ্যে আছে দুটি কাব্যসংকলন, একটি গল্পসংকলন, তিনটি উপন্যাস ও দুটি সমালোচনা গ্রন্থ। এছাড়া মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সহযোগিতায় তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চারটি কাব্য সম্পাদনা করেন। বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– *নদী নিঃশেষিত হলে* (১৯৬৩), *রবীন্দ্র ছোটোগল্প সমীক্ষা* (২ খণ্ড ১৯৬৩, ১৯৭৩), *নীড় সন্ধানী* (১৯৬৮), *নিশুতি রাতের গাথা* (১৯৬৮), *সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল* (১৯৬৮), *নিরুপায় হরিণী* (১৯৭০), *রাইফেল-রোটি-আওরাত* (১৯৭৩), *সমুদ্র শঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭৪) ইত্যাদি।

তাঁর *রাইফেল-রোটি-আওরাত* উপন্যাসটি রচিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আলবদরদের একটি দল তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা থেকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় এবং মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের কাছে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেন

শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন একজন বলিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি শহিদ হন। তিনি ১৯২৯ সালের ১লা মার্চ মাগুরা জেলার শালিখার অন্তর্গত শরশুনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৩ বছর ৬ মাস বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এরপর কিছুদিন চাচার তত্ত্বাবধানে ও পরে যশোরের মিছরিদিয়াড়া গ্রামের এক বিধবার বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৩ সালে ঝিকরগাছা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৪৫ সালে যশোর মধুসূদন কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করেন।

সিরাজুদ্দীন হোসেন সাংবাদিক হিসেবে ১৯৪৭ সালে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রথমে কলকাতায় এবং পরে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত একই পত্রিকায় ঢাকায় কাজ করেন। তিনি *ইত্তেফাক* পত্রিকার বার্তা সম্পাদক (১৯৫৪-১৯৬৬, ১৯৬৯), সংবাদ সংস্থা পিপিআই-এর ব্যুরো চিফ (১৯৬৬-১৯৬৯) এবং *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর নির্বাহী সম্পাদক (১৯৭০-১৯৭১) হিসেবে কাজ করেন। স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ এবং নির্ভীক সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন ছয় দফা আন্দোলন এবং পরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চালাকালীন তিনি অধিকৃত ঢাকায় *ইত্তেফাকে* দুঃসাহসিক সম্পাদকীয় লেখেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা দেন এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারের কাছে নিয়মিত প্রেরণ করেন। দেশ স্বাধীন হবার মাত্র ছয়দিন আগে ১৯৭১ সালে ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর চামেলীবাগের বাসা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে তিনি বাঙালির শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লিখেছেন, চেষ্টা করে গেছেন প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। শিশু-অপহরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখে তিনি সাংবাদিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

শহিদ সেলিনা পারভীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক সাহসী মানুষ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শহিদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী সাংবাদিক, সাহিত্যপ্রেমী এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার কারণে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী আলবদর বাহিনীর হাতে তিনি নির্মমভাবে শহিদ হন।

সেলিনা পারভীন ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ নোয়াখালী জেলার

রামগঞ্জ উপজেলার ছোটো কল্যাণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আবিদুর রহমান এবং মাতার নাম সাজেদা খাতুন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মনোয়ারা বেগম। তিনি ফেনীর সরলা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণে তাঁর নিয়মিত শিক্ষা ব্যাহত হয়। তবুও তিনি নিজের প্রচেষ্টায় সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যান এবং লেখালেখির প্রতি গভীর আগ্রহ গড়ে তোলেন।

কর্মজীবনের শুরুতে সেলিনা পারভীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালে নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন। পরে রোকেয়া হলে ম্যাট্রন হিসেবে কাজ করেন এবং আজিমপুর বেবি হোমে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি সলিমুল্লাহ এতিমখানাতেও কাজ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হন এবং ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৬৬ সালে তিনি সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকার সম্পাদকীয় সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে *ললনা* পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হতো। ১৯৬৯ সালে তিনি *শিলালিপি* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করতেন।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের আন্দোলন কর্মকাণ্ডে শরিক হন। পল্টনের জনসভায় বা শহিদমিনার থেকে বের হওয়া নারীদের মিছিলে যোগ দিতেন। শরিক হতেন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদসভাতেও। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখদের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সমাজতন্ত্রের প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেলিনা পারভীন মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নবভাবে সাহায্য করতে থাকেন। তিনি ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতেন। একই সঙ্গে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে লেখালেখি চালিয়ে যান। তাঁর এই কর্মকাণ্ড পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের দৃষ্টিতে তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর বাহিনী পরিকল্পিতভাবে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর সদস্যরা ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে সেলিনা পারভীনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরদিন ১৪ই ডিসেম্বর তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর মরদেহ ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমি থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ১৮ই ডিসেম্বর তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহিদ কবি মেহেরুন্নেসা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম নারী শহিদ কবি মেহেরুন্নেসা। তিনি ১৯৪২ সালের ২০শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের খিদিরপুরে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আবদুর রাজ্জাক, মা নূরুন নেসার চার সন্তানের মধ্যে মেহেরুন্নেসা (রানু) ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁরা ছিলেন চার ভাইবোন।

১৯৪৭ সালে বিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তাঁর পুরো পরিবার চলে আসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (ঢাকায়)। প্রথমে পুরান ঢাকায় থাকতেন। একপর্যায় মিরপুরে স্থায়ী হন। কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল শৈশব থেকেই। ১৯৫৪ সালে *খেলাঘরের* পাতায় তাঁর প্রথম কবিতা *চাষী* প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সময়ে *ইত্তেফাক*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *মাসিক মোহাম্মদীসহ* মূলধারার পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানকালে বাঙালিদের উদ্যোগে *অ্যাকশন কমিটি* গঠিত হলে তিনিও মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে এই কমিটির সভা-মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ সালে তিনি দুই ভাইকে নিয়ে মিরপুরে নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এসব কারণে ২৭শে মার্চ তাঁর বাড়িতে বিহারীদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি আলবদররা অতর্কিতে আক্রমণ করে। তাঁর দুই ভাই রফিক ও টুটুল এবং মাকেসহ তারা মেহেরুন্নেসাকে নারকীয়ভাবে হত্যা করে। ১৯৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বাংলাদেশ ডাকঘর তাঁর ছবি দিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

সবশেষে বলতে পারি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবল একটি ভূখণ্ডের মুক্তি নয়; এটি ছিল একটি জাতির আত্মমর্যাদা, ভাষা, সংস্কৃতি ও চিন্তার স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে যারা কলম, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে জাতিকে আলোকিত করেছিলেন, তারাই ছিলেন এ দেশের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বুঝতে পেরেছিল– একটি জাতিকে দুর্বল করতে হলে তার মেধা ও মননের উৎসকে ধ্বংস করতে হবে। তাই তারা পরিকল্পিতভাবে বেছে বেছে হত্যা করেছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, মানুষকে হত্যা করা গেলেও তাদের আদর্শ, চিন্তা ও অবদানকে কখনো হত্যা করা যায় না।

মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, আনোয়ার পাশা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন এবং কবি মেহেরুন্নেসার মতো মহান বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরঅম্লান হয়ে আছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁদের জীবন ও অবদান তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব, যাতে তারা জানতে পারে– কত ত্যাগ, কত রক্ত আর কত মেধার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের স্মৃতি হোক আমাদের অনুপ্রেরণা, তাঁদের আদর্শ হোক আমাদের পথচলার শক্তি।

মো. মোস্তাক আহমেদ: আইনজীবী ও ফ্রিল্যান্স লেখক

সিনেমার নারী– বাস্তবতা বনাম সত্যতা

সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা

নারী। দুই বর্ণের এই শব্দটি সারাবিশ্বের অর্ধেক অধিবাসীকে নির্দেশ করে। নারী মানেই যেমন প্রজন্মের ধারক, সন্তানের পালনকারী, তেমনই প্রয়োজনে বহ্নিশিখা থেকে সংসারের পালনকর্ত্রীও। সেই নারীকে নিয়ে গল্পের খাতায়, বইয়ের পাতায় বা সিনেমার ফিতায় তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র। যার

প্রভাব সমাজে পড়ে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও চরিত্র বুননে কোনোও স্থিরতা আসেনি। বিশেষ করে সেলুলয়েডে। সিনেমার নারী, নাটকের নারী বা বিজ্ঞাপনের নারী মানেই চোখের সামনে ভিন্ন ভিন্ন ক্যানভাস। আবার ফ্যাশন জগতে মঞ্চে হাঁটা নারীর আছে ভিন্ন রূপ। এই রূপ কতটা সত্য, কতটা কল্পনা তা নিয়ে আলাপের শেষ নেই বটে। তবে আলোচনার সূচনা এখানেই। কারণ পর্দার নারী মানে নিতান্তই কোনোও ভিনগ্রহের রূপকথা নয়। কারো না কারো কলমের আঁচড়ে লেখা সমাজের সেই রূপ যা বটেই প্রভাব ফেলে চারপাশে, মস্তিষ্কে, মননে।

একটা সময় বাংলা সিনেমার নারী মানেই ছিল আদর্শের প্রতীক। তা প্রেম হোক বা সংসারে। টানাপড়েনে বা তালে- গানে বেলা শেষে সংসারের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই তার সর্বসুখ নিহিত এমনটাই ছিল পর্দার প্রতিচ্ছবি। এ পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই চলে আসে বাংলা সিনেমার এক সময়ের অবিচ্ছেদ্য হাতিয়ার ‘সেলাই মেশিন’ ও তার অবস্থান। দিনের পর দিন কোনো না কোনো চলচ্চিত্রে সেলাই মেশিনকে দেখানো হয়েছে মায়ের জীবনযাপনের হাতিয়ার হিসেবে। যখনই সংসারে আর্থিক কষ্ট দেখা দিয়েছে তখনই সেলাই করে অর্থ উপার্জন করে মায়েদের স্বাবলম্বী হতে দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিংবদন্তি তারকা অভিনয় শিল্পী শাবানার নাম উল্লেখ করতেই হয়। কারণ অর্থকষ্ট, সেলাই মেশিন উত্তরণ- শাবানা এই নামগুলো ছিল একই মালায় গাঁথা মতির মতন অভিন্ন। যখনই পর্দায় কোনো পরিবার, ছেলে বা স্বামীকে দেখা গেছে অর্থ উপার্জনে হিমশিম খেতে তখনই শাবানা যে চরিত্রে অভিনয় করতেন তাকে সেলাই করে উপার্জন করতে দেখা গেছে। এমনকি বড়োলোক হয়ে যাবার মন্ত্রও দেখা গেছে সেলাই মেশিনের বুননে।

এবার আলোচনা হতে পারে, কেন নারী চরিত্র এবং সেলাই মেশিন সিনেমার পর্দায় গুরুত্বপূর্ণ? বা এর পেছনে কারণ কী? বিভিন্ন গবেষণাসহ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায়, এই ২০২৬ সালেও নারীরা অর্থ উপার্জনে পিছিয়ে আছে অনেকাংশে। এর বিভিন্ন কারণও সবাই জানে। শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব, সামাজিক বা ভৌগোলিক অবস্থান, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিবারিক শেকলও নারীকে পেছন থেকে জাপটে ধরে। এর পাশাপাশি নারীর নিরাপত্তা এখনও বিশাল একটি কারণ, যেটা সত্তর বা আশির দশকে প্রকট ছিল নির্দ্বিধায়। ফলে নারী চরিত্রে এমন একজনকে বাছাই করা হতো যার মাঝে স্বভাবসুলভ মায়ামমতা থাকবে– আবার প্রয়োজনে সে নিতে পারে সংসারের বোঝা। আর ঘরে বসে আয় করার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে এই সেলাই মেশিন। এখানে লক্ষণীয়, আজকালকার দিনে যা ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে বহুল পরিচিত– তা কিন্তু সেই আমলে সেলাই মেশিন দিয়ে আয় করে নারীরা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর পর্দার সেই নারী চরিত্র অনুপ্রাণিত করেছে সারা বাংলাদেশের নারীকে। ছেলেবেলায় খেলার ছলে বাসার বড়ো নারীদের দেখে কাপড়ে ফুল তোলা যে একটা পেশা হতে পারে এবং দেশের পরিচয় তা প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের বৃহত্তর নারীগোষ্ঠীর একাংশ গার্মেন্টসে কাজ করে।

বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ ভাগ আসে পোশাকশিল্প খাত থেকে, যার মূল চালিকাশক্তি প্রায় ৪০ লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক। গ্রামীণ পটভূমি থেকে আসা এই নারীরা শুধু সেলাই মেশিন চালিয়ে কাপড় তৈরি করছেন না, বরং তারা নিজেদের শ্রম, দক্ষতা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের

অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছেন। কারণ এই শিল্পের মোট শ্রমিকের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশই নারী। এর সাথে বাড়ি থেকে দূরে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মানসিকতা, আত্মসম্মন বোধ, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, ধৈর্য ইত্যাদিও সম্পর্কযুক্ত। ফলে সিনেমার পর্দায় দেখা সেলাই মেশিন শুধু চিত্রনাট্যের কোনো একটি অংশ নয়, এর মাধ্যমে সারা

বাংলাদেশের মেয়েকে দেখানো হয়, ঘরে বসে তারা কীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে। কী করে প্রয়োজনে পরিবারের দ্বায়িত্ব নিতে পারে সেই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিও গড়ে দিয়েছে এই সিনেমার সংগ্রামী নারী চরিত্র।

শুধু অর্থ উপার্জন নয়। আত্মরক্ষাতেও নারী চরিত্র বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে গোটা দেশের ওপর নারীদের ওপর। আর এও সম্ভব সেলুলয়েডের মাধ্যমে। এর প্রমাণ নব্বইয়ের দশকের মার্শাল আর্টনির্ভর সিনেমাগুলো যার সূচনা নায়ক রুবেলের মাধ্যমে। মাসুদ পারভেজ রুবেল সিনেমা জগতে যাত্রা শুরু করে মার্শাল আর্টভিত্তিক সিনেমা দিয়ে। *লড়াকু* সিনেমা ছিল প্রথম, যা মুক্তি পায় ১৯৮৮ সালে। তার সিনেমায় মার্শাল আর্ট নিয়ে বিভিন্ন কৌশল উপস্থাপন করা হতো। এর পাশাপাশি নারী চরিত্ররাও আত্মরক্ষায় আগ্রহী হতে অনুপ্রাণিত হতো। রুবেলের সিনেমাগুলোর অন্যতম নায়িকা ছিলেন মিশেলা। মিশেলা শুধু গ্ল্যামারকেই উপস্থাপন করেননি, তিনি মার্শাল আর্টেও পারদর্শী ছিলেন। ফলে বড়ো পর্দায় নারীকে নিজের আত্মরক্ষায় জয়ী হতে দেখে গ্রামবাংলার অনেক অঞ্চলেই মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়– যা আজও বিদ্যমান। বর্তমানে আত্মরক্ষার সাথে শারীরিক সুস্থতার জন্যেও অনেক নারী মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিশ্বজুড়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যখন বিভিন্ন ধরনের আলাপ হয়ে আসছে, তখন আত্মরক্ষার বিষয়টিও ফেলনা নয়। যা কি না বাংলাদেশের বড়োপর্দাতেও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়ছে সেই আশির দশক থেকে। এর আগে নারীর কথা, শব্দ বা সাংসারিক প্রতিবাদ হলেও , এককভাবে নিজেকে রক্ষা করার মতো কৌশল আয়ত্তে আনার তাগিদও দেয় নারী চরিত্রগুলো।

সিনেমাগুলোতেও নারী মানেই শুধু নাচ-গান বা আকর্ষণীয় উপস্থাপন নয়, বরং বলিষ্ঠ চরিত্রে নারীর অবস্থান তুলে ধরা হয়। একারণেই মিশেলা ও অন্যান্য নারী শিল্পীরা ১৯৯০-এর দশক ও ২০০০-এর শুরুর দিকে বাংলা সিনেমায় কারাতে ও মার্শাল আর্টভিত্তিক ধারার একটি আলাদা জায়গা তৈরি করেছিলেন। এই ধারার প্রভাব শুধু বিনোদনে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি দর্শকের চিন্তা, নায়ক-নায়িকার ধারণা, এমনকি শরীরচর্চা, সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে বাংলা সিনেমার তথাকথিত সাংসারিক আয়োজন থেকে নারী চরিত্র পায় নতুন মাত্রা। যেমন, নারী চরিত্রকে শুধু 'গানের নায়িকা' থেকে বের করে আনা; নারীও মারামারি, আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধে সক্ষম– এই ধারণা প্রতিষ্ঠা ও নারীকে শক্তিশালী ও সক্রিয় চরিত্র হিসেবে দেখানো। অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি নারীকে আত্মরক্ষাতেও পথ দেখানোর অন্যতম মাধ্যম এই বড়ো পর্দাই।

বাংলা সিনেমার প্রভাব বা সিনেমার প্রভাব কীভাবে একটি জাতিকে নির্দেশনা দেয়, তা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু বিষয় যেখানে নারী, সেখানে এই প্রবন্ধে নারী ও তার উপস্থাপন নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়াই শ্রেয়।

নব্বই দশকের শেষদিকে যখন সিনেমা হলগুলোতে দর্শক কমতে শুরু করে, তখন প্রযোজকরা দ্রুত জনপ্রিয়তা পাওয়ার সহজ উপায় খুঁজতে থাকেন। এর ফল হিসেবে সিনেমায় কৃত্রিমভাবে যুক্ত করা হতে থাকে 'আইটেম ড্যান্স' বা অশ্লীল দৃশ্য। এই প্রবণতা অনেক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, পুরো সিনেমার গল্পের সঙ্গে এসব দৃশ্যের কোনো সম্পর্কই থাকত না।

এই সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয়েছে নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে। কাটপিসের মাধ্যমে নারীকে একধরনের ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার শরীরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিনোদনের একটি আলাদা ধারা, যেখানে তার ব্যক্তিত্ব, চিন্তা বা অনুভূতির কোনো গুরুত্ব নেই। নারী সেখানে কেবল একটি দৃশ্যমান বস্তু– যার কাজ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ফলে সিনেমায় নারীর যে মানবিক ও বহুমাত্রিক চিত্রায়ন হওয়া উচিত ছিল, তা অনেকটাই আড়াল হয়ে গেছে।

এই প্রভাব শুধু সিনেমার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। দর্শক যখন বার বার এমন উপস্থাপন দেখে, তখন নারীর প্রতি একটি ভোগবাদী মনোভাব তৈরি হতে পারে। নারীকে মানুষ হিসেবে না দেখে একটি অবজেক্ট হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ধরনের উপস্থাপন নারীর প্রতি সম্মান ও সংবেদনশীলতা কমিয়ে দিতে পারে। এসময়ের অন্যতম যে বিষয় 'নারীর প্রতি সহিংসতা', তার পেছনে যে বিনোদন অঙ্গনের প্রভাব নেই– এটি বললে নিতান্তই একটি গুরুতর সমস্যাকে উপেক্ষা করা হবে।

যখন সিনেমার পর্দায় বার বার নারীর প্রতি অসম্মানজনক বা যৌনতামূলক উপস্থাপন দেখা যায়, তখন তা ধীরে ধীরে সমাজে 'স্বাভাবিক' বলে মনে হতে পারে। এই স্বাভাবিকীকরণ (normalization) দীর্ঘমেয়াদে নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা কমাতে পারে, যা পরোক্ষভাবে সহিংস আচরণের পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন গবেষণাতেও তা প্রতিষ্ঠিত। কারণ গবেষণা বলে, সিনেমা দর্শকদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Catharsis) করতে সাহায্য করে এবং তীব্র আবেগ অনুভব করায়। এটি মানুষের হাসতে, কাঁদতে বা বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে হিংসা ও ক্রোধকেও সামনে তুলে ধরে। এজন্য ইতিহাস থেকে শুরু করে বিপ্লব ও বিদ্রোহ টিকে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় সিনেমার মতন বিশাল ক্যানভাস। সেখানে বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা হালের কয়েকটি সিনেমা নিয়েও মন্তব্য করেছেন সমালোচকরা। যে সিনেমাগুলোতে নারীকে কূটচালক- লোভী বা ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকায় দেখা গেছে। যেমন *পরাণ বা সুরঙ্গর* মতো সিনেমা। এসকল সিনেমাগুলো নিয়ে দর্শক প্রতিক্রিয়া জানান যে, এধরনের সিনেমা ও নারীর চরিত্র বর্তমানের প্রেক্ষাপটে নারীকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিবে।

আবার বর্তমানের সিনেমাতে নারীকে এমন কোনো শক্তিশালী চরিত্রেও দেখা যায়নি, যা সেলাই মেশিন বা মার্শাল আর্টের মতন কোনো ট্রেন্ড সেট করতে পারে। এর মাঝেও, *মেইড ইন বাংলাদেশ* বা *রেহানা মরিয়াম নূর*- সিনেমাগুলো নারীকে ফিরিয়ে এনেছে বলিষ্ঠ চরিত্রে, যেখানে নারীর গল্প ফুটে উঠেছে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সেখানে ব্যক্তিগত জীবনযুদ্ধ বা সমাজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রমাণ করার গল্প ফুটে উঠেছে।

এই পরিবর্তন আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে চলচ্চিত্রের নতুন জোয়ারে নির্মিত কিছু চলচ্চিত্রে। *ন ডরাই* (২০১৯) সিনেমাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যেখানে একজন নারীর সার্ফারের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রটি সমাজের বাধা অতিক্রম করে নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করে। এখানে নারী আর নিছক ভুক্তভোগী নয়; তিনি সংগ্রামী, আত্মবিশ্বাসী এবং স্বনির্ভর।

একইভাবে রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত ২০১৯ সালের *মেইড ইন বাংলাদেশ* চলচ্চিত্রে একটি গার্মেন্টস শ্রমিক নারীর জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন এবং প্রতিরোধ অত্যন্ত বাস্তবভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই ধরনের চলচ্চিত্র সেই নারীদের গল্প শোনায়, যারা সমাজের প্রান্তিক স্তরে থেকেও প্রতিদিন লড়াই করে যাচ্ছে।

এছাড়াও *রেহানা মরিয়ম নূর* চলচ্চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে একজন নারী চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের দ্বন্দ্ব, সামাজিক চাপ এবং নৈতিক অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রটি জটিল, দৃঢ় এবং বাস্তব– যা বাংলাদেশের সিনেমায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে।

তার পরেও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের একটি বড়ো অংশে এখনও নারীকে গ্ল্যামার বা বিনোদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয় এখনো। অনেক ক্ষেত্রে নারী চরিত্রের উপস্থিতি শুধু নায়কের গল্পকে আকর্ষণীয় করার জন্য। তার নিজস্ব কোনো গভীরতা বা বিকাশ সেখানে থাকে না। ফলে একদিকে যেমন কিছু চলচ্চিত্রে নারীর শক্তিশালী উপস্থাপন দেখা যায়, অন্যদিকে অনেক চলচ্চিত্রে পুরানো ধ্যানধারণাই পুনরাবৃত্তি হয়।

এই দ্বৈততা আসলে সমাজের ভেতরের দ্বৈততারই প্রতিফলন। বাংলাদেশে একদিকে নারীরা শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, উদ্যোক্তা-উদ্যোগ এবং সৃজনশীল শিল্পে এগিয়ে যাচ্ছে; অন্যদিকে এখনও অনেক ক্ষেত্রে তারা বৈষম্য, সহিংসতা এবং সামাজিক বাধার সম্মুখীন

হচ্ছে। সিনেমা এই দুই বাস্তবতাকেই একসঙ্গে ধারণ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা *এশা মার্ডারও* এক নারী চরিত্র প্রধান সিনেমা হলেও এতে নারীকে লালসার শিকার হতে দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র যেমন, *দাগী* বা *বরবাদে* ধর্ষণের মতন অপরাধকে অতি সাধারণভাবেও উপস্থাপন করা হয়।

সিনেমার পর্দায় নারীর উপস্থাপন সমাজের উপর প্রভাব ফেলেই তার কারণ যে-কোনো সময়ে সিনেমাই একমাত্র ভাষা— যা সকল দর্শককে মোহিত করে। দুই বা তিন ঘণ্টা শুধুমাত্র পর্দায় চোখ রেখে একজন দর্শক প্রতিটা সিনেমার কোনো না কোনো চরিত্রে নিজেকে আবিষ্কার করে।

প্রযুক্তির জয়জয়কারের এই কালে আরেকবার বার বার সিনেমা ও নারীর পর্দায় উপস্থাপন নিয়ে তাই আলোচনা চলমান আছে এবং থাকবে।

২০২৬ সালে নারী দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয়ও এমনটাই। ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য— 'অধিকার, ন্যায়বিচার, উদ্যোগ সব নারীর জন্য হোক'। এই তিনটি ভিত্তির তৈরির পেছনে বড়ো পর্দার সক্রিয় ভূমিকা থাকা অতীব জরুরি। যেখানে হয়ত প্রশিক্ষণ পৌছায় না, কিন্তু কোনো না কোনো মাধ্যমে পৌঁছে যায় সিনেমার সংলাপ; যেখানে হয়ত কোনো আইনের কথা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেও গানে গানে পৌঁছে যায় অধিকার আদায়ের গল্প। ফলে সিনেমার মাধ্যমে যদি দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল হওয়ার মন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়— তাহলে নারীর মৌলিক চাহিদা কেন নয়!

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় একটি সিনেমার কথা, যা আজ অবধি বাংলা সিনেমার অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসেবে আলোচনায় উপস্থিত থাকে, তা হলো- *জীবন থেকে নেয়া*। এই সিনেমার মূল চরিত্রে আছে তিন নারী, যেখানে পরিচালক জহির রায়হান তথাকথিত পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে দেশ গড়ার শক্তিশালী বাণী ছড়িয়ে দেন। জহির রায়হান ও আমজাদ হোসেন রচিত এই সিনেমার গল্পে এমন নারীকে দেখানো হয়, যার নেতৃত্ব ছাড়া বাসা অচল। এর বিপরীতে অপর দুই নারীকে দেখানো হয় যারা চিত্রনাট্যের স্রোতে একটা সময় দৃঢ় মনোবল ও কঠোর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির তাই এই চলচ্চিত্রকে 'বাংলাদেশের প্রথম জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চলচ্চিত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিন কেন্দ্রীয় নারীকে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের কথা সে সময়ে বলেন যখন বাংলাদেশের জন্মও হয়নি। নারীকে এই সিনেমার মাধ্যমে এতটাই বলিষ্ঠ রূপে নির্মাতা প্রতিষ্ঠা করেন। এর তিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন— রওশন জামিল, রোজী সামাদ ও সুচন্দা।

এরপর আরেকটি সিনেমা যেখানে একজন গ্রামের সহজসরল মা, যার কাছে একমাত্র অবলম্বন ও সম্পদ তার সন্তান, তাকে ত্যাগ করে দেশের জন্য। সেলিনা হোসেনের উপন্যাস *হাঙর নদী গ্রেনেড* অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটির নাম উপন্যাসের নামেই। পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম। ছবিতে সেই বলিষ্ঠ নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচরিতা। সহজসরল অথচ কতটা বলিষ্ঠ চরিত্র এক নারীর হতে পারে তা দেখানো হয় চলচ্চিত্রে যা এক নিমিষে দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। এটাও তুলে ধরে যে মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল ধরনের মানুষের কতটা ত্যাগ ছিল। হয়ত গল্পের প্রয়োজনে তরুণদের কথাই বার বার ফুটে ওঠেছে, কিন্তু বাংলাদেশের নারীদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের আত্মত্যাগ শুধু 'বলার অভাবে' জানা হয়ে উঠেনি। অস্ত্র না তুলেও নারী কীভাবে যুদ্ধের ময়দানে সাহস দিয়ে মোকাবিলা করেছে তার প্রমাণ *হাঙর নদী গ্রেনেড*। *গেরিলা* সিনেমাতেও দেখা গেছে নারীর বহ্নিশিখা রূপ।

চলচ্চিত্র বা বড়ো পর্দায় নারীর উপস্থাপনে বরাবরই গ্ল্যামার প্রাধান্য পায়। সারাবিশ্বেই অনেকটা এরকম। পাশাপাশি এখন বিভিন্ন চিত্রনাট্য নারীকে ভিন্নভাবে— সহজ ও শক্তিশালী রূপে সামনে তুলে ধরাও শুরু করেছে।

যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্র *'ইংলিশ ভিংলিশ'*। একজন নারীর, যে নিজে উপার্জনও করেন শুধু ইংরেজি না জানার কারণে পরিবারে ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত হন।

এমন কি নিজের সন্তানও তাকে নিয়ে কুণ্ঠা বোধ করে। এমন অবস্থায় নিজের কথা বলার জন্য তার যে অস্ত্র তা হয়– ভাষা। শশি চরিত্রে অভিনয় করা শ্রীদেবীর মাধ্যমে সমাজের সেই রূপটা চোখে পড়ে যা হয়ত সাধারণ মানুষ প্রায়ই দেখে কিন্তু বোঝে না নারীর অবমূল্যায়ণ কীভাবে হচ্ছে।

আবার ইংরেজি সিনেমা, *আলাদিন* (২০১৯)-এ দেখা যায়, এমন এক রাজকুমারীকে যা এতদিন ধরে পাঠক পড়ে আসছে, গল্পে যেমনটা থাকে। কোনো এক রাজকুমার এসে রাজকুমারীকে বিয়ে করে রাজ্যপাঠ নিয়ে নিবে। ঐ রাজকুমারই হবে রাজা। এমন রূপকথা গল্পের শেষ নেই বটে। কিন্তু উইলস্মিথ অভিনীত এই চলচ্চিত্রে দেখা যায়, সিনেমাটিতে রূপকথা সামান্য বদলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের রাজা রাজকুমারীকেই সিংহাসনের জন্য উপযুক্ত মনে করেছে। কারণ এই সিনেমার 'দুষ্টু লোক' যখন রাজাকে ধরে রাখে বা রাজ্যে নির্যাতন করে, তখন রাজকুমারীই নিজের রাজ্যের জন্য রুখে দাঁড়ায়। এই সিনেমায় যে কথাটি বলার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, যে রাজ্যের জন্য উপযুক্ত সেই পেতে পারে সিংহাসন। এর জন্য লিঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

সারাবিশ্বেরই চলচ্চিত্রে নারীকে যোদ্ধা- সাহসী হিসেবে অল্প করে হলেও তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু নারী কেবল যোদ্ধা নয়, নারী সামাজিক বন্ধনের খুঁটি, পারিবারিক ভারসাম্যের প্রতীক এবং চিন্তা-চেতনায় কঠোর– এই বিষয়গুলোও এখন বড়ো পর্দায় ফুটে উঠছে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র পর্দায় সিকিভাগ হলেও এই জোয়ার আসছে। এই জোয়ার বর্তমানের নয়। সেই 'সারেং বউ', 'গোলাপি এখন ট্রেনে', 'ভাত দে', 'বেহুলা' ইত্যাদি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই যাত্রার শুরু যার হাল ধরেছে 'রেহানা মারিয়াম নূর', 'ন ডরাই', 'মেইড ইন বাংলাদেশ'-এর মতো চরিত্রগুলো।

বড়ো পর্দায় নারীর সব ধরনের রূপ তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। আর এজন্য শুধু নারী নির্মাতাই কাজ করবে- এমনটা ভাবারও অবকাশ নেই। পুরুষের চোখ দিয়েও নারীর জন্য সংবেদনশীলতা, কোমলতা, সাহসিকতা তুলে ধরা প্রয়োজন। তাতে করে যারা দর্শক তারাও লিঙ্গ নির্বিশেষে অনুধাবন করতে পারবে একজন মা, একজন মেয়ে বা একজন অপরিচিত মেয়ে যে রোজ রাস্তায় বের হয়, তার জীবনের উত্থান-পতন। কারণ বড়ো পর্দার সেই শক্তি আছে যে শক্তি দিয়ে গোটা দেশের মানুষের ভাবনায় পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। তা যেমন ফ্যাশনে বা জীবনযাপনে- তেমনই নারীর প্রতি সহনশীলতায়।

এ শুধু নারী দিবস বা কোনো মাসভিত্তিক আলোচনা নয় বরং হয়ে উঠুক আজীবনের অভ্যাস। কারণ নারী সুন্দর, সাহসী এবং অপার সম্ভাবনার প্রতীক।

সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা: সাংবাদিক, লেখক, শিশু সাহিত্যিক, প্রশিক্ষক

একুশে পদক ২০২৬

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের ৯ জন ব্যক্তি এবং ১টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক ২০২৬ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তিনি এ পদক তুলে দেন।

স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের নাম হলো: অভিনয়ে ফরিদা আক্তার ববিতা, চারুকলায় প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সাত্তার, স্থাপত্যে মেরিনা তাবাসসুম, সংগীতে আইয়ুব বাচ্চু (মরণোত্তর), নৃত্যে অর্থি আহমেদ, পালাগানে ইসলাম উদ্দিন পালাকার, সাংবাদিকতায় শফিক রেহমান, শিক্ষায় প্রফেসর ড. মাহবুবুল আলম মজুমদার এবং ভাস্কর্যে তেজস হালদার জস। এছাড়া সংগীতে ওয়ারফেজকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: শ্রেয়সী শ্যামা

নিবন্ধ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

ফজিলা ফয়েজ

চল্লিশ দশকের বিদ্রোহী ও কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫ই আগস্ট ১৯২৬ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা তখন ব্রিটিশ-ভারতের একটি অংশ ছিল। তাঁর পিতা নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একজন প্রকাশক এবং একটি লাইব্রেরির মালিক। সেই সুবাদে সুকান্তের বিশ্বদৃষ্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কৈশোর থেকেই তিনি সাম্যবাদী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। সুকান্ত ছোটোবেলা থেকেই বিস্তৃত ধারণা ও দর্শনের সাথে পরিচিত। লেখালেখি ও কবিতার প্রতি সুকান্তের আবেগ প্রথম দিকেই বিকশিত হয় এবং শীঘ্রই তিনি নিজেকে একজন প্রতিভাবান ও প্রসিদ্ধ লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কবিতা সাহসী এবং বিপ্লবী চেতনার অধিকারী। সুকান্তের বিপ্লবী লেখা তাকে ব্যাপক পরিচিতি ও প্রশংসিত করেছিল। তার কবিতা শ্রেণি, ধর্ম, জাতিগত বাধা অতিক্রম করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে অনুরণিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী কবি সুকান্ত চল্লিশের বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব ও মরণ ছোবলের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। দেশ বিভাগের সহিংসতা এবং রক্তপাত প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিপীড়িত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের জন্য লড়াই করেন।

যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষে ঝাঁঝরা হলেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থেকেছিল বাংলাদেশ। দুর্ভিক্ষে লাশ হওয়া মানুষের কঙ্কালের উপর দিয়ে চলল ব্রিটিশের যুদ্ধের অভিযান। মৃত মানুষের হাড় গুঁড়িয়ে চলল ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যানের বহর। সেই বিচূর্ণ হাড়ের ভেতর থেকে জ্বলতে থাকল আগুন। জ্বলে উঠল প্রতিরোধের দাবানল। কোটি শিখা হয়ে দিকে দিকে জ্বলল স্বাধীনতার মশাল। সেদিনের সেই নব জাগ্রত বাংলাদেশকে বিপ্লবী কবি সুকান্ত দেখিয়েছেন তাঁর তিমির বিদারী উদার অভ্যুদয়ের এক রক্তিম সূর্যালোক। 'দুর্মর' শিরোনামের কবিতায় এই জাগরণকে নন্দিত করে তিনি লিখলেন:

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে;
সে কোলাহলে রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ্যর
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

এর পরের স্তবকে লিখেলেন:

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান;
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ

শেষে রক্তের হরফে আগাম বিজয়ের ঘোষণা রাখলেন বিপ্লবী তরুণ এই কবি:

সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়:
জ্বলে পুড়ে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়
এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়ত, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের
প্রাণ।

মহৎ কবিরা আগামী দিনকে ধারণ করে তাদের অনুভবে। চল্লিশ দশকের শেষ দিকে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ভবিতব্যের মতো।

দুই দশক পরে সত্তরে এসে জ্বলে পুড়ে ছারখার হওয়া বাংলাদেশের মাঠ থেকে আমরা তুলেছি স্বাধীনতার ফসল। আর সেই ফসল ছিল রক্তধোয়া। কারণ ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে রাঙা ছিল আমাদের মাঠের সেই ধান।

তাঁর কবিতাগুলো স্বাধীনতার জন্য একটি মিছিলকারী আর্তনাদ ও জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধের চেতনা জাগিয়ে তোলে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বাংলাদেশের প্রাণ
কেনো ঘরে ঘরে গড়ে উঠল এত রণাঙ্গন?
কেনো এত রক্ত বিসর্জন?

সুকান্ত এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন:

এসেছে নতুন শিশু... তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।

অঙ্গীকার ঘোষণা করে বলেন:

এ বিশ্বকে, এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি;

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার

পরের স্তবকে লেখেন:

অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে-
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।

কী আশ্চর্য মিল সুকান্তর এই পঙ্ক্তিগুলোর সঙ্গে সত্তর দশকের যুদ্ধের সাথে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণে আগামী দিনের শিশুদের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ রচনার প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছেন এই নতুন প্রজন্মের কবি। উচ্চকিত সরে গাইছেন:

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি;
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুকান্তের লেখাগুলো ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়। তাঁর বাণী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বাঙালির সম্মিলিত চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কালজয়ী কবিতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অটল অঙ্গীকারের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন। তাঁর কবিতাগুলো সামাজিক পরিবর্তন আনতে শিল্প ও সাহিত্যের শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ফজিলা ফয়েজ: কবি ও প্রাবন্ধিক

মাতৃভাষা দিবসের স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান । ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তিনি এ ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর এদিনই প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অফিস করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মদিবসের শুরুতে তিনি একটি স্বর্ণচাঁপা গাছের চারা রোপণ করেন।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

ঈদের সেই দিন

শাকেরা বেগম শিমু

ঈদ মানেই আনন্দ! ঈদ মানে খুশি। কিন্তু এই ঈদের দিনই যে এমন এক ভয়ংকর ঘটনা আমার সাথে ঘটে যাবে তা আমি কখনো ভাবতেও পারিনি! যাই হোক, আসল কথায় চলে আসি। তখন আমি হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি এবং সেসময় প্রতিটি ঈদেই আমি আমার বান্ধবী রুমার বাসায় বেড়াতে যেতাম। গিয়ে সবাই মিলে আনন্দ হৈ-হুল্লোড় করতাম। আমাদের বাসা ছিল কসবার ফেরাইগুষ্ঠিতে, ও তাদের বাসা ছিল বাগেরটিল্লায়! বাগেরটিল্লা বলতে যে তাদের ঐখানে একটা টিল্লা আছে আর ঐ টিল্লায় বাঘ আছে বিষয়টা এমন না। ওটা শুধুমাত্র একটি নামই ছিল। কামে কিছুই না বরং ঐখানে যেতে একটি বাশের সাঁকো পেরিয়ে যেতে হতো। সাঁকোর দুদিকে দুটি বাঁশ বাঁধা থাকত যেখানে হাতে ভর দিয়ে সেই সাঁকো পার হতে হতো। তো প্রত্যেক রোজার ঈদের দিন আমি ঐ সাঁকো পেরিয়ে রুমাদের বাসাতে বেড়াতে যেতাম। সেভাবে ক্লাস সিক্সে পড়াকালীন সময়ে ঈদের দিনে আমি ঠিক করলাম এবার আর একলা বেড়াতে যাবো না। আমার সাথে আমার দুই ভাই হাদী, অলি ছোটোফুফুর ছেলে জিবানকেও সাথে নিয়ে বেড়াতে যাবো। এতে রুমাও অনেক খুশি হবে। সেও প্রায়ই বলত তোর পরিবারের বাকিদের নিয়েও আসিস। ওদের সাথে আমার আম্মুর পরিচয় করিয়ে দেবো। তাই সেদিন ঈদে আমি আমার তিনভাইকে নিয়ে রুমাদের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আর সেদিনই আমার সাথে ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি!

ঘটনার দিন: ঈদের সেই দিন আমি, হাদী, অলি ও ফুফাতো ভাই জিবানকে ডেকে বললাম, আজকে তোরাও আমার সাথে আমার বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাবি। শুনে ওরাও খুশিমনেই রাজি

হলো। আমরা সবাই তখন পুকুরে গিয়ে ঈদের গোসল সেরে নতুন পোশাক পরে সেজেগুজে কিছু পিঠা, সন্দেশ ও সেমাই খেয়ে নিলাম। পরে বাড়ির বড়োদের সালাম করে ঈদের সেলামিও আদায় করে নিলাম। তারপরে সবাই খুশিমনে উড়ুউড়ু মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লাম রুমাদের বাড়ির উদ্দেশে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফেরাইগুষ্ঠির সীমানা পেরিয়ে শ্রীধরার মধ্য দিয়ে বাগেরটিল্লার পথে রওয়ানা দিলাম। একসময় আমরা সেই বাঁশের সাঁকোটার কাছেও পৌঁছে গেলাম। চিকন বাঁশের তৈরি সেই সাঁকোতে একেক জন করে এগিয়ে যেতে হয়। একসাথে দুজন পার হবার ব্যবস্থা নেই। আর এর নিচ দিয়েই বয়ে চলেছে প্রচণ্ড খরস্রোতা ঘোলাপানির লোলানদী! আমি আর হাদী সাঁতার জানলেও অলি আর জিবান ছিল খুবই ছোটো। তারা সাঁতারও জানত না। তাছাড়া এই খরস্রোতা নদীতে পড়লে বড়ো বড়ো সাঁতারাও অনায়াসে ভেসে যাবে সেখানে আমরা তো কোন ছার। তো আমরা প্রথমে একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম যে কীভাবে এই ছোট্ট চিকন সাঁকোটি পেরোব। তারপর হাদী বলল যে, আপা তুমি হাত ধরে অলিকে নিয়ে যাও আর আমি জিবানকে নিয়ে আসি। এই কথা আমার মনে ধরল। আমি তখন এক হাতে অলির হাত ধরে অন্য হাতে বাঁশের সাইডের ডাণ্ডিটায় ধরে ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগলাম। এভাবে আমরা অনেকটা পথই পেরিয়ে গেছি। কিন্তু নদীর মাঝ বরাবর আসতেই হঠাৎ অলি পা ফসকে বাঁশ থেকে পিছলে পড়ে গেল। ভাগ্যিস ওর হাতটা আমার হাতে ধরা ছিল। তাই সে বাদুড়ের মতো আমার একহাতে ঝুলন্ত অবস্থায় স্রোতস্বিনী নদীর উপর দুলতে লাগল! আমি তো ভয়ে প্রাণপণ চিৎকার দিচ্ছিলাম যে– হাদী জলদি নিচে এসে ওকে ধর! আল্লারে! একি হয়ে গেল। এদিকে হাদী আর জিবানও ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। কখন কী জানি কী হয়ে যায়!

আমি আবারো বললাম– হাদী আয় নারে নিচে এসে ওকে ধর!

হাদী বলল– আমি কী করে নিচে আসব? নিচে তো পানি?

তখন আমার খেয়াল হলো সত্যিই তো! নিচে তো পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এখানে সে আসবে কীভাবে আর ধরবেই বা কীভাবে? যা করার আমাকেই করতে হবে। আসলে আমি অলি পড়ে যাওয়াতে একেবারে দিশাহারা হয়ে গেছিলাম। তাই কী করব বা বলব তখন এই জ্ঞানই খুঁইয়ে বসেছিলাম।

ততক্ষণে আমাদের চিৎকারের শব্দে অপর পাশের কিছু ছেলেমেয়েও এখানে এসে জড়ো হয়েছিল। দেখে বুঝা যাচ্ছিল তারাও ঈদের দিন বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদের একজন অপর পাশ থেকে আমাদের দিকে হেঁটে আসতে লাগল। ততক্ষণে আমারো চেতনা পুরোটা ফিরে এলো। তখনো আমার অনুজ অলি আমার একহাতে ঝুলছিল নদীর উপরে আর ভয়ের চোটে চিৎকার করছিল। আমি তখন সন্তর্পণে ধীরে ধীরে টান দিয়ে

অলিকে উপরে তুলে বাঁশের সাঁকোতে রেখে দিই। আর বলে দেই সে যেন দুহাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। অলিও তাই করে। অবশেষে অনেক চেষ্টার পরে আমি অলিকে নিয়ে সেই সাঁকো পেরিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে নামি।

কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। আমাদের আরো দুজন সদস্য মানে হাদী ও জিবান এখনো সাঁকোর ওপাশে রয়ে গেছে! হাদী একটু সাহস করে নিজে নিজে সাঁকো পেরিয়ে এপারে চলে আসে। কিন্তু ভীতুর ডিম জিবান! সে গো ধরেছে সে আর এপারে আসবে না। সে বাড়ি চলে যাবে, তার ভয় করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোটো ফুফুর ছেলেটা একটু ছ্যাচড়া টাইপেরও ছিল। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে এই কথা তার মায়ের কানে যদি তুলে দেয় তো ফুফু এসে আমার সাথে তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়বেন। উপরন্তু আমি আর কোনো উপায় না পেয়ে ওপারে গিয়ে জিবানকে কোলে করে নদীর এপারে নিয়ে আসি। আমি নিজেই ছিলাম ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। চিকন বাঁশের সাঁকোর উপর একটা ছোটো বাচ্চাকে কোলে করে আনা নেহাত কম কঠিন ও ভয়ের কাজ ছিল না। কিন্তু কী আর করা! ঘটনার শুরুটা যখন আমার মাধ্যমেই হয়েছে তখন এর শেষটাও তো আমাকেই করতে হবে। ঈদের দিন বলে কথা! সারাদিনের আনন্দটা মাটি করতে চাই না। তাই আল্লাহর নাম নিয়ে ভয়ে ভয়ে অনেক কষ্টে জিবানকে সাঁকোর এপারে নিয়ে আসি। পরে যথারীতি রুমার বাসায় গিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করি, নাস্তা খাই, হইচই করি, শেষে ছোটো ভাইদের নিয়ে আমি অন্য রাস্তায় দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসি আমাদের বাসায়। সেদিনের সেই ঈদটা আমাকে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেছিল। ঈদের সেই দিন ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা আমার স্মৃতির পাতায় এক স্মরণীয় দিন হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেদিনের পর থেকে আর কোনো ঈদে কখনো আমি কোথাও বেড়াতে যাইনি। না আমার ছোটো ভাইদের নিয়ে, আর না আমি নিজে!

শাকেরা বেগম শিমু: লেখক

অন্য রকম দেহতত্ত্ব

রফিকুর রশীদ

ভোররাতের দিকে চেতনা ফিরে আসে নিয়ামতের। ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে ঘরের মধ্যেই আছে নাকি অন্য কোথাও? এখানে এই বন্দিশালায় কদিন আছে মনে করতে চেষ্টা করে। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজ। নামাজের পর নিজাম মিয়ার মুখোমুখি। রমজান আলীও তেড়ে আসে। তারপর সব এলোমেলো। এই কলেজ-ক্যাম্প, সীমাহীন নির্যাতন। শুক্র-শনি-রবি-সোম... আজ কী বার? না, হিসাব মেলাতে পারে না। আর কিছুই মনে পড়ে না। কী আশ্চর্য, আজ তার সারা শরীরের যন্ত্রণা গেল কোথায়? এরকম অনুভূতিশূন্য, নির্ভার, নিরবলম্ব মনে হচ্ছে কেন? সত্যিই সে বেঁচে আছে তো? ডান হাত দিয়ে বাম হাতের চামড়ায় চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কোথায় তার ডান হাত, কোথায় বাম হাত? পা দুটো? কোমরের নিচে তার পা দুটো আছে তো! ছুঁয়ে দেখতে সাধ হয়। না, সে সাধও পূরণ হবার নয়। হঠাৎ আবিষ্কার করে, সে যেন শ্বেতশুভ্র রাজহাঁস হয়ে গেছে। পানিতে ভাসছে, তবু সারা শরীর শুকনো ঝরঝরে। দুচোখ রগড়ে ভালো করে স্বচ্ছ চোখে ওই জলে ভাসা রাজহাঁস দেখতে ইচ্ছে হয়। চোখের পাতা মেলতে গিয়ে টের পায়, দুটি অক্ষিকোটরে তার একটিও চোখ নেই। এতক্ষণে নিয়ামতের ভারি ভাবনা হয়– হাত-পা নেই, চোখ-মুখ, মাথামুণ্ডু কিছু নেই। তাহলে সে আছে কোথায়? সে কি তবে শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পেরেছে? ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে– এও তাহলে সম্ভব? এ সময়ে তার ওস্তাদ আলেহীমের কথা মনে পড়ে যায়। কতবার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে– দেহটা হচ্ছে খাঁচা, সময়মতো ওই খাঁচার বাইরে নিজেকে বের করে আনতে পারলেই মজা। দেহ পড়ে থাকবে কাঠ-পাথর হয়ে, পড়ে পড়ে মার খাবে; পাবলিক বলো আর পুলিশ বলো মারতে মারতে এক সময় হেদিয়ে যাবে, মুখে ফেনা উঠে যাবে তাদের, খাঁচার বাইরে থেকে তুই এসব ক্যাদ্দানি দেখবি, তবেই তো মজা! আমাদের এ লাইনে এই দেহতত্ত্বটাই আগে রপ্ত করতে হয়, গাধা কোথাকার!

নিয়ামত আর কিয়ামত, ছিঁচকে চুরি দিয়েই যাত্রা শুরু দুই ভাইয়ের। যত্রতত্র ধরা পড়ে। বেশুমার মার খায়। হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকে। হাজত খাটে মাসকে মাস। বেশ কবছর পর জেলখানার মধ্যেই পরিচয় হয় আলেহীম ডাকাতের সঙ্গে। ওস্তাদ মেনে তার কাছে দীক্ষা নেয় দুই ভাই। দেহতত্ত্বের দীক্ষা– এ লাইনে হাত পাকাতে হলে নিজের দেহের ওপর ষোলো আনা নিয়ন্ত্রণ আনা চাই। নইলে দেহটাই তোকে পদে পদে বিপদে ফেলবে। দেহটাই গুটিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে আয়, দেখবি তখন কত মজা! ওস্তাদ এইসব তত্ত্বকথা বলে আর হা হা করে হাসে। সেবার হাজত থেকে বেরুনোর পর ওস্তাদের শেখানো সূত্র ধরে দুই ভাই বহুদিন ওই বিশেষ ধারার দেহতত্ত্বের সাধনা করেছে। কিয়ামত অতি দ্রুত বেশ খানিক সাফল্যও অর্জন করে। সেই সাফল্যে বেশি বেশি তড়পায়। ওস্তাদের ওপর বাটপারি করে ভাইকে শিক্ষা দেয়– মনোযোগটাই আসল কথা। যে-কোনো একটা দিকে ভালো করে মনোযোগ দাও, আর সব দিক তুচ্ছ হয়ে যাবে। সেই কিয়ামত চুরি-ডাকাতি ছেড়ে মনোযোগ দিলো চোরাচালানের দিকে। ঢাকার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ। মেহেরপুরে বসে তদারকি করে সে মোটা পার্সেন্টেজ পায়। বর্ডারের দুপারেই তার কড়া যোগাযোগ, তবু গত বছর বিএসএফ-এর গুলিতে সে নিকেশ হয়ে গেল। অতি বাড় বাড়লে তার এই হয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। না, নিয়ামত ওইসব বেহিসেবি ব্ল্যাকের কারবারে যায়নি। তার ধান্দা একটাই। রাতের গভীরে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে গেরস্থ বাড়িতে হানা দেওয়া। কিন্তু মার্চ-এপ্রিল জুড়ে সারাদেশে কী যে রাজনৈতিক ডামাডোল শুরু হয়, নিয়ামতের এতদিনের ধান্দাপাতিতেও এলোমেলো ঝাপটা লাগে। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যে তার দুজন সঙ্গী সে ঝাপটা সামলে নেয়। দূর-দূরান্তের দেশত্যাগী মানুষ মেহেরপুরের সীমান্ত হয়ে পিঁপড়ের সারির মতো ভারতে পাড়ি জমাতে শুরু করলে তাদের পোটলা-পুটলি দেখে কালু এবং রুস্তমের চোখ চিকচিক করে ওঠে। ওরা বিপন্ন শরণার্থীদের ধমক-ধামক দিয়ে সোনাদানা কেড়ে নেয়। এ কাজে নিয়ামতের রুচি হয় না। লুটের মালের ভাগ দিতে এলে সে বরং রুস্তমকে শাসিয়ে দেয়– তোদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, সাবধান। পাল্টা যুক্তি দেখাতে উদ্যত হয়েছে রুস্তম, কিন্তু নিয়ামতের লাল টকটকে চোখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে সুড়সুড় করে পালিয়েছে। ঝিনেদা-চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত মিলিটারি চলে এসেছে শুনে মেহেরপুর এবং চারপাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ছুটে যায় ভারতে। নিয়ামতের কোথাও যাবার ইচ্ছে হয় না। অতি শৈশবে বাপ-মায়ের হাত ধরে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ভারত থেকে পালিয়ে এসেছিল বলেই হোক কিংবা আগের বছর ভারতীয় বিএসএফ-এর গুলিতে ভাতৃবিয়োগের কারণেই হোক, নিয়ামত ভারতে যেতে চায় না। শহর থেকে মাইলখানেক দূরে রাস্তার পাশে তার বাড়ি, সারাদিন দেশত্যাগী মানুষের তোড়জোড় দেখে নানান গুজব শোনে, রাত হলে বাড়ি ফিরে আসে।

এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরীর নির্দেশে সরকারি গাড়িতে করে বস্তা বস্তা টাকা ভারতে নিয়ে যাবার পর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের বারান্দায় খুচরো টাকাপয়সা কুড়ানোর মচ্ছব হয়, খাদ্যগুদাম থেকে পাল্লা দিয়ে গমের বস্তা সরাতে গিয়ে মালোপাড়ার রহিম বক্সের মাথায় বস্তা গড়িয়ে পড়ে কোমর ভেঙে যায় – এ সবই সে ঘুরে ঘুরে দেখে। দেখতে দেখতে তার হাসিও পায়। দৌলত মিয়া কেন ট্রেজারির তলানি কুড়াতে যায়, রহিম বক্স কেন গোডাউনের গম সরাতে যায় – এসবের কিছুই মেলাতে পারে না বলে তার হাসি পায়।

সব গুজবের কবর দিয়ে এপ্রিলের ১৮ তারিখে মিলিটারি আসে মেহেরপুরে। আমঝুপিতে এবং ওয়াপদা মোড়ে গণহত্যা চালায়। হিন্দুপাড়ায় বেপরোয়া লুটপাট, অগ্নিসংযোগ হয়। দীনু ডোম ভারতে না যাওয়ায় তার গর্ভবতী বৌ মালতি ধর্ষিত হয়। নিয়ামত বুঝতেই পারে না এসবের মানে কী! সারারাত শুয়ে শুয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, সত্যি এ সবের মানে কী! কিছুতেই ঘুম আসে না চোখে। ওয়াপদা মোড়ের লাশগুলোর মধ্যে মদনাডাঙ্গার তিনজনকে সে খুব স্পষ্ট চিনতে পেরেছে। চিনেই-বা কী করবে? লাশ টেনে বাড়ি পৌঁছে দেবে! চারদিকে জনমুনিষ্যির সাড়াশব্দ নেই, একা একা কটা লাশ টানবে! সন্ধ্যার আগে আগে সে কেবল কলাঝাড়ের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে এসেছে এখানে-সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে হতভাগ্য মানুষের লাশ। এখন চোখের পর্দাজুড়ে সেই লাশের দাপাদাপি, ঘুম আসে কী করে? এপাশ-ওপাশ করতে করতেই রাত পার হয়ে যায়, ঘুম আসে না। ভোরের পাখিরা কলকণ্ঠে ডেকে উঠলে নিয়ামত বিছানা ছেড়ে উঠোনে নেমে আসে। নিজের বাড়ি, তবু তার গা ছমছম করে। অকারণে দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে উঠোনে পায়চারি করে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বেশ কপাক পায়চারি করতে করতে ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে আসে চারদিক। নিয়ামত হঠাৎ কুয়োতলায় এসে ওজু করে বাড়ির পাশের মসজিদে উঠে গলা ছেড়ে আজান দেয়। বহুদিনের অনভ্যস্ততায় অথবা অন্তর্গত অন্য কোনো আতঙ্কে তার কণ্ঠস্বর ভেঙেচুরে যায়। যেন-বা ভোরের বাতাসকেই আরো ভারি করে তোলে। নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম– এই ঘোষণাতেও কারো ঘুম ভাঙে না। প্রতিদিন নামাজের আহ্বানে ঘুম ভাঙায় যে রমজান চাচা, সেই লোকটিরও দেখা মেলে না। ভোরের আলো ফোটার পরও কারো সাক্ষাৎ না পেয়ে অবশেষে সে একাই নামাজে দাঁড়ায়। কিন্তু নামাজের নিয়ম-কানুন, সূরা-কালাম কিছুই মনে পড়ে না। সেই কোন শৈশবে বছরখানেক মক্তবে গিয়েছিল, তার বাপের খুব ইচ্ছে ছিল ছেলেকে দেওবন্দ মাদ্রাসায় পাঠাবে, পাকিস্তানে চলে আসার পর আর কিছুই হয়নি। ওপারে যেটুকু দোয়া-দরুদ শিখেছিল, দিনে দিনে তাও নিঃশেষে গুলে খেয়েছে। নামাজে দাঁড়িয়ে নিয়ামত শেষ পর্যন্ত কী করে! আল্লাহর কাছে হাত তুলে যা মনে আসে তাই বিড়বিড় করে বলে। অনেকক্ষণ হাত তুলে থাকে, তার যেন কথা ফুরায় না। এক সময় খুট করে একটুখানি শব্দ হতেই সালাম

ফেরানোর মতো করে ডান দিকে তাকায়।

আর তখনই সে নিমের দাঁতন হাতে রমজান মুন্সিকে দেখতে পায়। হাতের দাঁতন তার মুখে ওঠে না, চোখে-মুখে প্রবল বিস্ময়– কেরে নিয়ামত, তুই? তুই আজান দিলি নাকি?

– হ্যাঁ চাচা, আমি। ঘাড়-মাথা-চুলকে নিতিবিতি করে আবদার জানায়, ভুলভাল হলে মাফ করে দিয়েন।

– ভুল? বাসি থুতু ছিটিয়ে রমজান মুন্সি একটুখানি হেসে ওঠে, এ দুঃসময়ে তোর ভুল ধরবে কে? অ্যাঁ?

– না মানে, কোথাও কোনো মসজিদে আজান হলো না দেখে বুকের ভেতরে ছটফট করে উঠল চাচা, আমি আর বাড়িতে থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।

রমজান মুন্সি দাড়ির গোছায় হাত বুলায়– বেশ করেছিস। আজ তো বড়ো মসজিদেও আজান হয়নি।

– না, কোথাও হয়নি।

ওই বড়ো মসজিদের আজানের পর আমি রোজ আজান দিই। রমজান মুন্সি একটু থেমে বেশ কবার দাঁতন ঘষার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে– তা বাপু গলা ছেড়ে আজান তো খুব দিলি, তোর ওজু ঠিক ছিল তো?

মুখে কথা না বলে নিয়ামত কেবল ঘাড় দুলিয়ে জবাব দেয়। এরপর আর কখনো সে পিছু ফিরে তাকায়নি। পাক বাহিনীর আক্রমণের পর শহর কিংবা গ্রাম সবই প্রায় বিরান হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ ভারতে পাড়ি জমায়। শরণার্থী নয়। মুক্তিফৌজ হয়। নিয়ামতের দু-চারজন ইয়ার-বন্ধুও ওই দলে নাম লেখায়। কিন্তু নিয়ামত মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। সে দেশ ছাড়ে না, বাড়ির পাশের ওই মসজিদও ছাড়ে না। মেহেরপুর কলেজ, কাজী নজরুল স্কুল, ভোকেশনালজুড়ে পাক বাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে রমজান মুন্সির কাজের পরিধি এবং ব্যস্ততা বেড়ে যায়। মুসল্লির সংখ্যা হাতে গোনা আট-দশজন, তারা নিয়ামতের পরিবর্তন দেখে অবাক হয়। দু-একজন আবার সন্দেহ-কুতকুতে চোখে তাকায়। টুপি-দাড়ি দ্যাখে, হাতে-তসবিহ-জোব্বা পোশাক দ্যাখে। নিয়ামত চোখ নামিয়ে নেয়। এইসব অবলম্বন নিয়ে সে নিজের দেশেই টিকে থাকতে চায়।

মাস দুয়েক পর রমজান মুন্সি রাজাকার হবার প্রস্তাব দিলে নিয়ামত ভীষণ চমকে ওঠে, রীতিমতো ভিমরি খাবার জোগাড়। বহু কেঁদে কঁকিয়ে সে যাত্রা নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু সারারাত ঘুমোতে পারে না। গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মসজিদে যায়। পায়চারি করে। কাঠের তৈরি যে মিম্বরে বসে ইমাম সাহেব শুক্রবারের খুতবা শোনান, সেইখানে ধপাস করে বসে পড়ে। খুব চিন্তা হয়, এতদিন পর রমজান চাচা কেন এই প্রস্তাব দিলো? রাজাকারে লোক নিচ্ছে সেই কবে থেকে এতদিন তো কই বলেনি। তাহলে?

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর খুতবার ফাঁকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং জাতীয় শত্রু প্রসঙ্গে আলোচনা উত্থাপিত হলে একজন মুসল্লি মন্তব্য করে, এশার নামাজের পর সে নাকি সেন্টুকে দেখেছে এই মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে।

–সেন্টু?

রমজান মুন্সি যেন আঁতকে ওঠে– সে তো দুষ্কৃতকারী। তাকে ধরিয়ে দাওনি কেন?

সেন্টুর নাম করেছিল যে লোকটি, সে আর কিছুতেই মাথা তোলে না। কিন্তু সহসা এ কথা চাউর হয়ে যায়, ওই সেন্টু হচ্ছে নিয়ামতের চ্যালা। পিস কমিটির নেতা নিজামউদ্দীন চোখ কপালে তুলে গজরাতে গজরাতে এগিয়ে আসে– শালা ডাকাত, তলে তলে তল্লা বাঁশ। সকলেই নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ে, সেন্টু নিশ্চয় নিয়ামতের কাছেই এসেছিল। এরপর আর কালবিলম্ব না করে সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিয়ামতের ওপর। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনোই সুযোগ থাকে না তার। বরং এই উন্মত্ত গণপিটুনির ধাক্কাধাক্কিতে ইমাম সাহেবের মিম্বার একটুখানি সরে যেতেই তার তলা থেকে আচানক বেরিয়ে পড়ে ভয়ংকর সব আলামত। গ্রেনেড, বোমা এবং বেশ কয়েকটি কাটা রাইফেল।

এরপরের ঘটনা আর বিশেষ কিছুই মনে পড়ে না নিয়ামতের। জ্ঞান ফেরার পর টের পায় রক্তাক্ত মেঝেতে সে শুয়ে আছে। সারা শরীরে পাথুরে ক্লান্তি। কানে আসে নির্যাতিত মানুষের গোঙানি। কিন্তু তার গলায় কোনো স্বর ফুটছে না কেন? তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কার কাছে চাইবে পানি? চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে বেশ কবার গণপিটুনির শিকার হলেও এত কষ্ট তার হয়নি। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে তার তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। সে কাতরে ওঠে– পানি। সহসা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যমদূত। প্যান্টের জিপার টেনে কলকলিয়ে প্রস্রাব করে দেয় নিয়ামতের মুখে– পিয়ো শালা বাঙালি, শরাব পিয়ো। দাড়িগোঁফে ভর্তি মুখমণ্ডল তা ভরে যায়। চোখ বন্ধ করে সে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু যমদূত শুনবে কেন? চুলের মুঠি ধরে উঠিয়ে বসায়, হাতের ব্যাটন দিয়ে শুরু হয় পেটানো, সেই সঙ্গে উল্টাপাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ– কারা আসে তোর কাছে? কারা? আর অস্ত্র কই? অস্ত্র নিয়ে এই একই ধারার প্রশ্ন অবিরাম চলে। নিয়ামত মুখে চাবি এঁটে রাখে। নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ভঙ্গি পাল্টে যায়। মাঝে মধ্যে রমজান মুন্সি এসে তদারকি করে যায়। মুখ খোলাতে না পেরে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ব্যাটন নিয়ে নিজেই পেটাতে শুরু করে। মারতে মারতে এক সময় রমজান মুন্সিই হেদিয়ে পড়ে। মার খেতে খেতে এরই মাঝে একদিন ওস্তাদের কাছে শেখা দেহতত্ত্বের কথা মনে পড়ে যায় নিয়ামতের। সেদিন তার মলদ্বারে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে নির্যাতন করা হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে আসে। ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠলে তার উপরেই হান্টার। আর কতক্ষণ! এক সময় নেতিয়ে পড়ে দেহ, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। ভোররাতে ধীরে ধীরে চেতনা ফেরার সময় তার মনে হয় সে অতি ছোট্ট শিশু, তিন-চারদিন পায়খানা হয়নি বলে দাদিবুড়ি তার পাছায় পানের বোঁটা গুঁজে দিয়েছে, অপেক্ষায় আছে কখন হয়... কখন হয়। নিয়ামত এক সময় ভড়াৎ করে অতিশয় দুর্গন্ধ বিষ্ঠা ঝেড়ে দিয়ে আরাম পায়। ঘনঘোর অন্ধকারেই সে যেন-বা দেখতে পায় তার পাছায় জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দিচ্ছিল যে সেপাইটি, দুর্গন্ধ বিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখে-মুখে। সে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একাকার। নিয়ামতের তখন বেশ মজা লাগে। পরদিন তার পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝোলানো হয়। প্রথম দিকে ভীষণ কষ্ট। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করাই মুশকিল। বাজার থেকে মোরগ-মুরগি কিনে বাড়ি আনার সময় সবাই তো ওই রকম উল্টিয়ে ঝুলিয়েই নিয়ে আসে।

তুচ্ছ প্রাণী হয়েও ওরা তো বেশ শরীরের নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে। এ কথা ভাবতেই নিয়ামত সহসা ঝুঁটিঅলা বদরাগী মোরগ হয়ে যায়। পাখা ঝাপটিয়ে, পায়ের নখে আঁচড়ে, ধারাল ঠোঁটে ঠুকরে-খুবলে একশেষ। পরদিন আবার কৌশল পাল্টায়। ঝুলন্ত অবস্থায় গরম পানির বালতিতে মাথা চুবিয়ে দেয়। জোর করে পানির মধ্যে চেপে ধরে রাখে। পানিতে বিন্দু বিন্দু ভুড়ভুড়ি ওঠে। নিয়ামত তখন তালপুকুরের অথৈ পানিতে সাঁতার কাটে– ডুবসাঁতার। শৈশবের অতি চেনা বিশাল পুকুর। একবার ডুব দিলে সঙ্গীরা সহজে কেউ খুঁজে পায় না। কালো মিশমিশে পানিতে তলিয়ে যায়। সবাইকে চমকে দিয়ে ভোঁস করে ভেসে ওঠে বিশ হাত দূরে। দুহাতে পানি ছিটিয়ে দেয় সঙ্গীদের গায়ে। কিন্তু সেদিন বালতির ভেতর থেকে মাথা তুলতেই দেখতে পায় শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে রমজান মুন্সি। চোখে-মুখে গরম পানির ছিটা পড়তেই দাঁতখিঁচিয়ে ওঠে– শালা, শুয়োরের বাচ্চা।

এভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন, এক সপ্তাহ, দুসপ্তাহ পার হতে হতে এক সময় নিয়ামতের দেহতত্ত্বের সাধনা পূর্ণ হয়। ধীরে ধীরে যতই চেতনা ফিরে আসে, ততই মনে হয় দেহের খাঁচা থেকে তার মুক্তি ঘটছে ক্রমশ। দিব্যি সে বেরিয়ে আসছে খাঁচা থেকে। ওই তো আদিগন্ত সবুজ মাঠ। এই সবুজের হাতছানি সে উপেক্ষা করবে কী করে? হঠাৎ বুটের শব্দে সে সচকিত হয়। একা নয়, কয়েকজন। অচেনা ভাষার টুকরো টুকরো সংলাপ শোনা যায়। কী বলছে ওরা? রমজান মুন্সি খতম? মুক্তিবাহিনীর কাজ? নিয়ামতের ভারি আনন্দ হয়। প্রাণখুলে হাসতে ইচ্ছে করে। দরজা খোলার শব্দ হয়। গটমট করে এগিয়ে আসে ওরা। নিয়ামতের বোধশূন্য দেহে লাথি কষে শুরু করে নির্যাতন। বুটজুতোয় পিষে দেয়। থেঁতলে দেয়। বেয়োনেটে বাগিয়ে তেড়ে আসে একজন। অথচ এদের গলদঘর্ম আয়োজন দেখে নিয়ামত ভেতরে ভেতরে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। ভোরের আলোয় তার সে হাসি সবুজ ধানের কচি পাতায় ঢেউ খেলে যায় নেচে নেচে ॥

―――― ○ ――――

মায়ের স্বপ্ন

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

নয় মাস পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয়ের মুখ দেখল; দেশ স্বাধীন হলো। যেসব মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে বেঁচে ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়িতে চলে এলো। আর যে সব মুক্তিযোদ্ধারা ঘাতক পাকহানাদারদের হাতে শহিদ হন, তাদের রণক্ষেত্রেই সমাধি হলো!

এমনি এক মুক্তিযোদ্ধার মা ছেলের জন্য অপেক্ষা করে, কবে সে ফিরে আসবে! তার বিশ্বাস, তার ছেলে শোয়েব জীবিত আছে এবং সে ফিরে আসবেই।

শোয়েবের বন্ধু সোহেল, কোয়েল, রনি, রাজীব সবাই ফিরে এসেছে। ওরা জানে, শোয়েব বেঁচে নেই! তবুও বৃদ্ধ মাকে মিথ্যা শান্ত্বনা দিয়ে বলে, শোয়েব বেঁচে আছে। যুদ্ধ করতে করতে ও দল ছাড়া হয়ে পড়েছিল। তাই আসতে দেরি হচ্ছে।

কিন্তু শোয়েবের বোন শান্ত্বনা বুঝতে পারে যে, তার ভাই বেঁচে নেই! তবুও সে মাকে বোঝায়, মা তুমি ভাইয়ার জন্য চিন্তা করো না। ভাইয়া একদিন আগে আর পরে হোক ফিরে আসবেই।

মা মেয়েকে বলে, তোর কথা যেন সত্যি হয় মা!

শোয়েবের মা প্রতি রাতেই ছেলের কথা স্মরণ করে কাঁদে। শান্তা তখন এসে তাকে শান্ত্বনা দেয়। কান্না থামায়।

এক রাতে শোয়েবের মা ছেলের কথা স্মরণ করে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ সে দরজায় নক করার শব্দ পায়। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে, ছেলে শোয়েব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তখন সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে জোর গলায় বলে, শোয়েব তুই ফিরে এসেছিস! আজ যে আমার কত ভালো লাগছে, বোঝাতে পারব না!

শোয়েব বলে, হ্যাঁ মা ফিরে এসেছি। তবে ক্ষণিকের জন্য। রাত পোহাবার আগেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

মা এতে রাগ হয়ে যায়। ফিরে যেতে হবে কেন? তুই কি তোর মায়ের সঙ্গে থাকবি না?

–থাকতে তো ইচ্ছে করে। কিন্তু আল্লাহ তো সবার ইচ্ছে পূরণ করে না।

মা তখন দুঃখ ভরা কণ্ঠে বলে, তাই বলে আল্লাহ আমার ইচ্ছেটাই পূরণ করবে না!

–না-মা। তোমার মতো অনেক মা-ই আছে। যারা তাদের সন্তানদের কাছে পাচ্ছে না।

–তুই এখন কোথায় আছিস? কেমন আছিস? কিছুইতো বললি না।

–মাগো আমি এখন যেখানে আছি সে জায়গাটা তোমার পাশে

থাকার মতোই পবিত্র সুন্দর! বেহেশত।

মায়ের আবেগ বেড়ে যায়। তাই বলে কেউ মাকে ছাড়া থাকে?

–মাগো শুধু আমি নই, আমার অনেক বন্ধু আছে, যারা মাকে ছাড়া এখানে আছে। তাদের সাথে সুখেই আছি।

–কিন্তু আমি তো তোর জন্য কেঁদে কেঁদে অস্থির!

–না মা, তুমি আর কেঁদো না। সব আল্লাহর ইচ্ছেতেই হয়েছে। তুমি শুধু খুশি হও, তোমার ছেলে দেশ স্বাধীন করেছে এ জন্য!

মায়ের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, আবেগের স্বরে বলে, তবুও তো সবার ছেলে ঘরে ফিরে এলো! আমার ছেলে এলো না!

–আসলে তোমরা মা জাতি বড়ো বেশি স্মৃতি ভারাক্রান্ত! স্মৃতিকে মনের মাঝে ধরে রেখে তোমরা কেঁদে কেঁদে অস্থির হও।

–স্মৃতিকে তো মন থেকে ভুলাতে পারছি না।

–কেন মা, তুমি না একদিন বলেছিলে সোহেল, কোয়েল, রনি, রাজীব তোমারই সন্তান। তোমার এক ছেলে ফিরে না আসুক, অন্যরা তো ফিরে এসেছে। ওদের মাঝেই তুমি তোমার শোয়েবকে খুঁজে পাবে।

মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, তা-তো চেষ্টা করছি!

শোয়েব এবার মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা তোমার কি মনে পড়ে সেই ২৫শে মার্চের কালরাত্রির কথা? যে রাতে ঐ পাকহানাদাররা হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর ওপর! রক্তে রঞ্জিত করেছিল ঢাকার পথ-ঘাট-প্রান্তর!

–মনে পড়বে না কেন? রেডিওতে খবর পাওয়া মাত্রই তো তুই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলি। আমি আর শান্তা বের হতে দেইনি।

–পরদিনই-তো তোমার আর্শীবাদ নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে রহমান ভাইয়ের অধীনে ট্রেনিং নিয়ে স্টেনগান কাঁধে অপারেশনে বের হয়েছি ঐ শত্রু-সেনাদের খতম করতে! পর পর কয়েকটি অপারেশনে আমরা জয়ী হয়েছি ওদের বিরুদ্ধে- শেষ অপারেশনের সময় ঐ পাকহানাদারদের একটি বুলেট আমার পায়ে এসে বিদ্ধ হয়। আমি মাটিতে বসে পরি। তখন আরেকটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় আমার কপালে! আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরি। আমার আর মনে নেই। পরে দেখলাম সেই রণক্ষেত্রেই আমার সমাধি হয়েছে!

মা আক্ষেপ করে বলে, তোকে কি আমি আর কোনো দিন কাছে পাব না?

–পাবে। তোমার ছেলে দেশকে স্বাধীন করেছে বলে আনন্দিত হও! আর সোহেল, কোয়েল, রনি ও রাজীবের সাথে তোমার সন্তানের মতোই আচরণ করো। দেখবে সেখানেই তোমার শোয়েব আছে।

মায়ের মন মানে না। প্রশ্ন করে, তুই কি তোর মায়ের কথা ভুলে গেলি?

–না মা, আমি তোমার আর শান্তার কথা ভুলিনি। আমি এখন যেখানে আছি সেখানে চির শান্তি বিরাজমান! সেখানে পৃথিবীর কোলাহল নেই। নেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বনাশ ও ক্ষতি! নেই একই মানুষের জীবনে অন্য মানুষের আগুনের মতো অভিশাপ লেলিয়ে দেওয়ার শক্তি! তবুও এত শান্তির মাঝে আমি তোমাদের সব খবর রাখি।

–শান্তা তো তোর জন্য পড়াশুনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

–না মা, ওকে বলো ভালো করে পড়াশুনা করতে। আমার মনের অসম্পূর্ণ কাজটি ওকেই করতে হবে।

–ও কি আমার কথা শুনবে?

–হ্যাঁ মা, শুনবে। ওকে বলবে, আমার আশা ছিল ডাক্তারি পড়ার কিন্তু পারিনি। ২য় বর্ষে থাকাকালীন অবস্থায়-ই যুদ্ধে যোগদান করে শহিদ হলাম। আমি দেশকে স্বাধীন করে গিয়েছি। আর ও এখন এই স্বাধীন দেশের গরিব জনগণকে ডাক্তার হয়ে সেবা করবে। তাতেই আমার অতৃপ্ত আত্মা শান্তি লাভ করবে।

মায়ের দুঃখ ভরা প্রশ্ন, তুই কি তাহলে চলেই যাবি?

–হ্যাঁ মা, ভোর হবার আর দেরি নেই। আমাকে এবার যেতেই হবে। তুমি শুধু মা আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারিনি বলে।

মায়ের আবদার । শোয়েব তুই যাওয়ার আগে শান্তার সাথে দেখা করে যা। আজ থেকে যা, থেকে যা!

পাশের ঘর থেকে শান্তা রাতের বেলা মায়ের একা একা কথা বলা শুনে ঘুম থেকে জেগে যায়। বিছানা উঠে শান্তা দেখতে পায়, ভোর হয়ে গেছে এবং মা বিছানায় শুয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে!

শান্তা মায়ের কাছে গিয়ে বলে, মা তুমি কার সাথে কথা বলছ?

মায়ের ঘুমও তখন ভেঙ্গে যায়। সে ঘুম থেকে জেগে দেখে ভোর হয়ে গেছে এবং তার পাশে শান্তা দাঁড়িয়ে। তখন সে শোয়েবকে কাছে দেখতে না পেয়ে রাগে-ক্ষোভে শান্তাকে ধমক দিয়ে বলে, আমি শোয়েবের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তুই এসে আমাকে বাধা দিলি!

শান্তা তখন বুঝতে পারে যে, মা স্বপ্ন দেখেছে। তাই মাকে আর কিছু না বলে শান্তা নিজের ঘরে চলে যায়।

ছুটছে নারী

ঊষা মল্লিক

আমরা নারী, আমরা কারও বা বন্ধু, কারও বা বোন,
আমরা আবার কখনো কারও কারও নিকট আত্মীয়স্বজন।
আমরা কখনো কারও স্ত্রী, কখনো বা কারও জননী,
বিশ্বের দরবারে, নারীকে নিয়ে আছে, হাজারও হাজারও কাহিনি।
সবাই জানে, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'
তবুও কখনো নারী সহ্য করে চরম অপমান,
সমাজে এখনো নারীকে লাঞ্ছনা করার প্রবৃত্তি, আছে বর্তমান।
পণপ্রথার মতো জঘন্যতম নিয়মের বেড়াজালে এখনো কতো নারীর প্রাণ হচ্ছে শেষ,
আজও কন্যা ভ্রূণের, কিছু পরিবারে হত্যা চলছে বেশ।
আজও কতো নারী ধর্ষিত হয়, দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে,
কিছুটা তার খবর পেলেও, বেশির ভাগ খবর থাকে আজও আমাদের অজান্তে।
রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রেনে, আজও নিরাপদ নয় নারী,
দানবরা তো এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সারি সারি।
স্কুলের গণ্ডি না পেরিয়ে, বাল্যবিবাহে সামিল হতে হচ্ছে কতো ছোটো ছোটো মেয়েকে,
ছেলে আর মেয়ের মধ্যে পরিবারে রয়েছে বৈষম্য, প্রাধান্য দিচ্ছে ছেলেকে।
দূর হোক এই ভেদাভেদ, দূর হোক এই ধারণা,
ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবাই এক, জাগুক এই চেতনা।
নারী আজ পিছিয়ে নেই, হয়েছে সে আজ আগুয়ান,
সবাই মিলে করি আমরা, নারী জাতিকে সম্মান।
নারী আজ প্রবেশ করেছে জলে, স্থলে আর আকাশে,
তার গুণের সুমিষ্ট সুবাস, ভাসে এই বাতাসে।
আজ এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে নেই নারী,
প্যান্ট-শার্ট পরে ও দৌড়াচ্ছে তারা, অনেকেই ছুটছে পরে শাড়ি।
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দাপটে চলছে নারীরা,
ব্যাংক, রেল, বিমানেও নারীরা ফেলেছে সাড়া।
হাসপাতাল আর প্রযুক্তিতেও নারীদের মহিমা খুবই দৃশ্যমান,
পরিবার আর কর্মস্থলে, তাদের ভূমিকা একদম সমান।
দেশ রক্ষাতেও নারীরা আজ সামনে এগিয়ে এসেছে,
দেশের সব বিভাগেই, নারীরা আজ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে।
শুধু মাত্র আজ, এই নারী দিবসেই নয়,
নারীর জয়গান যেন প্রতিদিন আর প্রতিনিয়ত হয়।
আমরা সবাই জানি, মুক্ত জনগণ ভরিয়ে দেবে পৃথিবীর মুক্ত বাতাস,
যেখানেই নারীরা থাকবে পৃথিবীজুড়ে অর্ধেক আকাশ।
আজ এই নারী দিবসে সব নারীকে জানাই, আমার হৃদয়ের হার্দিক শুভেচ্ছা,
বিশ্বের সব নারী যেন থাকে দুধে-ভাতে, থাকুক আমাদের এই প্রচেষ্টা।

ঈদটা হোক সবার

মোহাম্মদ শামীম মিয়া

রোজার শেষে ঈদের খুশি
আসবে সবার ঘরে,
সুখের ছোঁয়ায় মনটা তখন
হাসবে নতুন করে।

ধনী-গরিব এক হয়ে সব
সাম্য-প্রীতির গানে,
ফুটিয়ে দেব হাসি যত
দুঃস্থজনের প্রাণে।

পড়ব নামাজ সবাই মিলে
হাতটি রেখে হাতে,
নতুন কাপড় বিলিয়ে দেব
খুশির দিন ও রাতে।

স্বপ্ন পূরণ হোক না সবার
সবাই যেন হাসে,
হিংসা ভুলে থাকব মোরা
গরিব-দুঃখীর পাশে।

নতুন জামায় খুশির ঝিলিক
দেখব চোখে-মুখে,
দুহাত সবার বাড়িয়ে দেব
তাই তো ওদের সুখে।

সবার জন্য করব দোয়া
পাপ মুছে যাক সব,
দুঃখীর পাশে থাকলে জানি
হাসবে আমার রব।

বুক তার বাংলাদেশ

রেজাউদ্দিন স্টালিন

ইথারে ইথারে বেজে উঠলো দামামা
ঘোষণা হলো মুক্তিযুদ্ধ
বঙ্গোপসাগর থেকে কালুরঘাট
কেঁপে উঠছে আবেগে উচ্ছ্বাসে
অপেক্ষায় অপেক্ষায় উন্মত্ত মানুষ
পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি
আনন্দ ঘাসে ঘাসে

অধীর জনতা ঘোষণা শুনল মুক্তিযুদ্ধের
মুক্তিযুদ্ধের বার্তাবাহক
কৃষক শ্রমিক আর কুলবধূগণ
প্রত্যেকে জানে তিনি অনুবাদ করবেন
মানুষের স্বপ্নসমূহ

গ্রামে ও নগরে বাজে বাঁশি
তোরণে তোরণে তোপধ্বনি
মসজিদ, মন্দির, গির্জায় প্রার্থনা
মুক্তি পাবে সুন্দরবন
মুক্তি পাবে আকাঙ্ক্ষা
মুক্তির গানে ভরে উঠবে দেশ
আমাদের উঠোনে দাওয়ায়
বসবে আড্ডা চা খানায় মাঠে ময়দানে
তাঁর ঘোষণা অভয় মানুষের
প্রশান্তি স্বাস্থ্য ও শুশ্রূষা
স্বাধীনতা প্রিয় মাতৃদেশ
অপার আদর্শ বুকে
তিনি সেনানায়ক
শোনা যায় কণ্ঠস্বর
শোনা যায় প্রার্থিত মুক্তির গান
বিজয়ের আনন্দে
জেগে ওঠে পাড়া
বুক তাঁর বাংলাদেশ সে
দেবে পাহারা। [সংকলিত]

চিরকালের স্মৃতি

আফিয়া সিদ্দিকা

ছাব্বিশে মার্চ, স্বাধীনতার ঘোষণা
স্বাধীনতার সূর্য, বাঙালির প্রাণের স্পন্দন
বীর বাঙালির হৃদয়ে জ্বলছে যে আগুন
স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারিত হলো সেদিন।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এলো স্বাধীনতা
বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র বাঙালির গর্বের ধন
স্মৃতির উত্তাপে ধুলিকণা ওড়ে যেখানে
স্বাধীনতা স্তম্ভ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বাঙালির মান।

ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস
বাঙালির হৃদয়ে চিরকালের স্মৃতি
জাগরণের দিন স্বাধীনতার দিন
বাংলাদেশ আমার দেশ আমার প্রাণ।

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা দিয়েছেন প্রাণ
তাঁদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও সম্মান
ছাব্বিশে মার্চ বাঙালির অন্যতম গর্ব
স্বাধীনতার এই দিন বাঙালির হৃদয়ে চিরস্মরণীয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন, বাঙালি আজাদ
স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে আকাশে
বাঙালির হৃদয়ে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি
ছাব্বিশে মার্চ বাঙালির ইতিহাসের সোনালি দিন।

আমাদের দেশ

কুলসুম বিবি

আমাদের দেশটা যে সবচেয়ে সেরা,
সাগর-পাহাড়-বন চারপাশে ঘেরা।
ফুল-ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি,
শীতল মাটির ঘ্রাণ প্রাণে বাজে বাঁশি।

জালের মতো বিছিয়ে খাল-বিল-নদী
নিটল জলের ঢেউ চলে নিরবধি।
মাঠ-ঘাট-পথে শুনি বাউলের গান,
সবুজের সমারোহ নদীর কলতান।

ধুলি মাখা পথ আর চৈতালি খরা,
শনশন বায়ু বহে গিরি পথে ছড়া।
নীলিমার গায়ে দোলে জ্যোৎস্নার হাসি,
আমাদের দেশটাকে বড়ো ভালোবাসি।

প্রসব যন্ত্রণা

শাহেদা আলম

স্বৈরাচারীর পাশবিকতায়
বাঙালি সত্তায়
অঙ্কুরিত হলো একটি বীজ
নবজাতকের জন্ম দেবার
একটি ভ্রূণ।
অন্তঃসত্ত্বা মা-এর
অপার আনন্দ হৃদয়ে
নতুন শিশু আসবে কোলে,
দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে
ভ্রূণের পুষ্টি।
ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয় গর্ভধারিণী,
তবুও পরম তৃপ্তি এক নতুন আস্বাদ,
সন্তানের মা হবার–
তাই মলিন বদনে স্বপ্নবুননে
আশার ইঙ্গিত।
দীর্ঘ ন মাস পেরিয়ে
ভ্রূণটির পরিপূর্ণতা লাভ,
একটি শিশুর আকার নিয়েছে
জননীকে করেছে বিদগ্ধ
কাতর, অস্থিচর্মসার।
জুলুম খোরের হিংস্রলীলার ফল
অবৈধ সন্তান–
তবুও বিচলিত নয় মাতা
দুচোখে তার বিভ্রান্তি নেই
আছে মাতৃবাসনার উজ্জ্বল দীপ্তি
(কারণ) পূত পবিত্র নিষ্পাপ এ সন্তান
যন্ত্রণা! দারুণ যন্ত্রণা!
গর্ভের শিশু হাত-পা ছুড়ছে
মুক্তির দাবিতে–
প্রসবিনী অস্থির
নিশ্বাসে নিশ্বাসে
প্রাণ বুঝি যায়!
প্রসব যন্ত্রণা কাতর মা-এর
করুণ আকুতি–
আমায় উদ্ধার কর জাদু
তোকে জন্ম দিতে এত কষ্ট!
আমি যে মরতে বসেছি।
হঠাৎ তীব্র এক যন্ত্রণা–
প্রসূতি সজোরে আঁকড়ে ধরে নিজেকে।
বাঙালি সত্তার গর্ভ হতে
বেরিয়ে এলো নাড়ি ছেঁড়া ধন
বিজয় পতাকা হাতে
রক্তস্নাত এক নতুন শিশু
'বাংলাদেশ– সোনার বাংলাদেশ'।

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি জাহানারা আরজু

কাজী মারুফা

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি, সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জাহানারা আরজু চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২রা মার্চ গুলশানের নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ৯৩ বছর বয়সি এই কবি। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

জাহানারা আরজু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের মা। তার জীবনসঙ্গী মরহুম একে এম নুরুল ইসলাম ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য এবং বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি।

১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর মানিকগঞ্জের জাবরা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পিতা আফিল উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, মাতা খোদেজা খাতুন। শিক্ষার সূচনা নিজ জেলায়; পরে ইডেন মহিলা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কৈশোরেই লেখালেখির হাতেখড়ি তার। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে সাড়া ফেলেন। এজন্য শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও মহাকবি কায়কোবাদ তাকে আশীর্বাণী দিয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে *আজাদ*-এর 'মুকুলের মাহফিল'-এ তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। পরবর্তী সময়ে *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *বেগম*, *মিল্লাত* ও *ইত্তেহাদ*সহ নানা সাময়িকীতে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়।

জাহানারা আরজু ১৯৪৯ সালে কবি সুফিয়া কামালের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক *সুলতানা*, যা নারী সম্পাদিত ধারায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। পরে *পরিক্রম*-এ যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন; টিবি অ্যাসোসিয়েশনের পাক্ষিক *হেলথ বুলেটিন* ও সাহিত্যপত্র *সেতুবন্ধন*-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

তাঁর সৃষ্টিকর্মে মানবিক বোধ, প্রেম, প্রকৃতি ও সমাজ-বাস্তবতার নিবিড় উপস্থিতি দেখা যায়। সহজ ভাষায় গভীর অনুভব প্রকাশ ছিল তাঁর শক্তি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– *নীলস্বপ্ন* (১৯৬২), *রৌদ্র ঝরা গান* (১৯৬৪), *সবুজ সবুজ অবুঝ মন*, *আমার শব্দে আজন্ম আমি*, *ক্রন্দসী আত্মজা*, *বাদল মেঘে মাদল বাজে* এবং একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে স্বনির্বাচিত কবিতার সংকলন *শোণিতাক্ত আখর* (১৯৭১)। তাঁর কবিতা অবলম্বনে নির্মিত হয় চলচ্চিত্র *মেহেরজান*।

বাংলা সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে লাভ করেন একুশে পদক। জীবদ্দশায় অর্জন করেছেন ২৬টি সাহিত্য সম্মাননা। তাঁর কয়েকটি রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন জীবনসঙ্গী নুরুল ইসলাম, যিনি নিজেও ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী শিক্ষার্থী ছিলেন।

জাহানার আরজুর প্রথম নামাজে জানাজা বাদ মাগরিব গুলশানের আজাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাজা বাদ এশা ও তারাবির নামাজের পর মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার খলিলপুর নিজ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মরহুমাকে সেখানেই তাঁর স্বামীর কবরের পাশে দাফন করা হয়।

হাম (Measles): আপনার যা জানা প্রয়োজন

World Health Organization
Bangladesh

হাম একটি খুব সহজে ছড়ানো ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত শিশুদের বেশি হয়। যেসব শিশু টিকা নেয়নি বা সম্পূর্ণ টিকা পায়নি, তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। হামের থেকে সুরক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ২ ডোজ সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণ করা।

হামের লক্ষণ ও উপসর্গ:

- সারা শরীরে র‍্যাশ: প্রথমে মুখে শুরু হয়, পরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫-৬ দিন থাকে।
- উচ্চ জ্বর
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- কাশি
- চোখ লাল হওয়া ও পানি পড়া
- মুখের ভিতরে ছোট সাদা দাগ

আপনার শিশুকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন:

- ৯ মাস ও ১৫ মাসে দেওয়া এমআর (হাম-রুবেলা) টিকার ২ ডোজ সম্পূর্ণ করুন।
- নিয়মিত সব টিকা সময়মতো দিন
- আসন্ন এমআর টিকাদান ক্যাম্পেইনে অংশ নিন
- সন্দেহভাজন (জ্বর ও র‍্যাশ থাকা) রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিন

কারও হাম হলে কী করবেন:

- দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিন
- আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন
- শিশুকে আলাদা রাখুন (স্কুল, ভিড় বা খেলার জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখুন)

কোথায় সাহায্য বা তথ্য পাবেন:

- নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী (হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট)

©World Health Organization Bangladesh

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 09, March 2026, Tk. 25.00

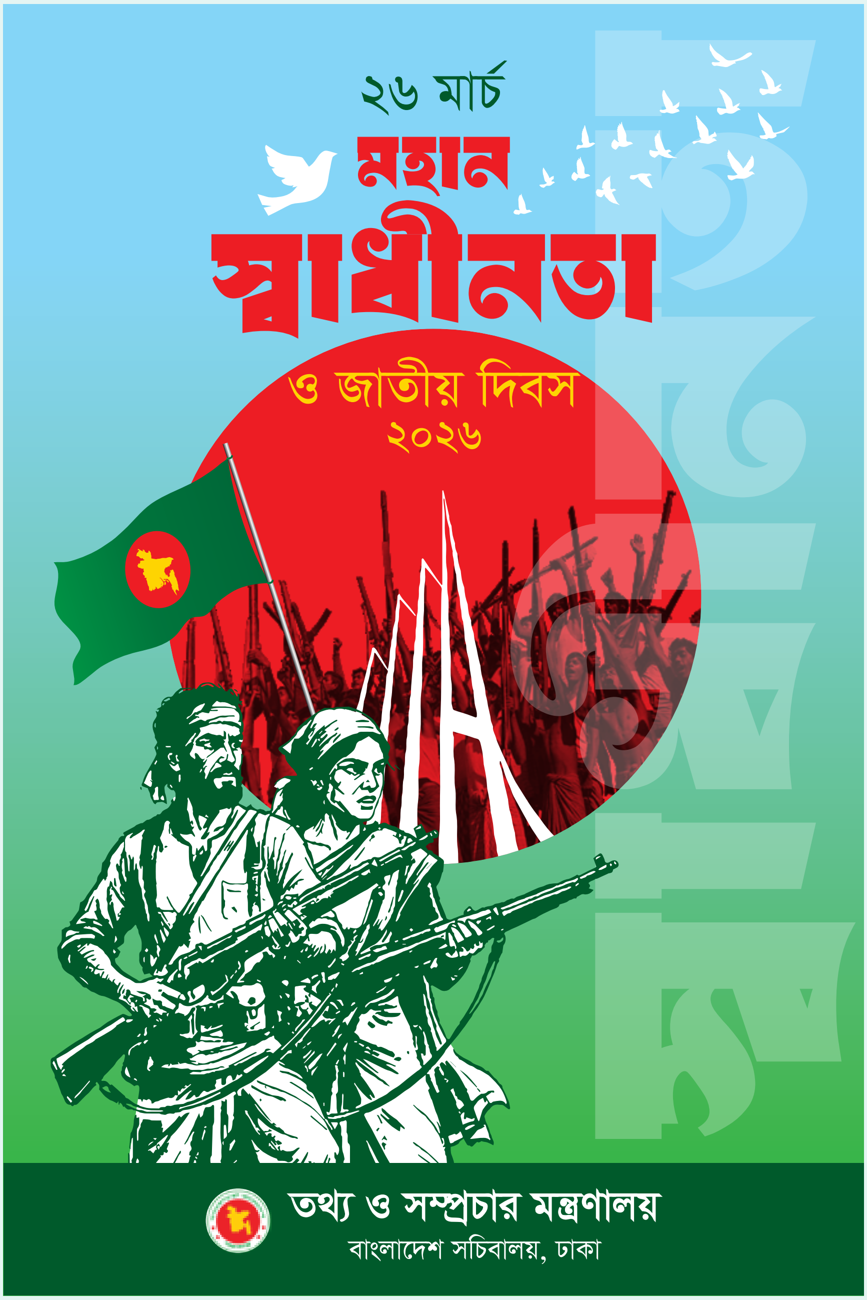

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd